যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস

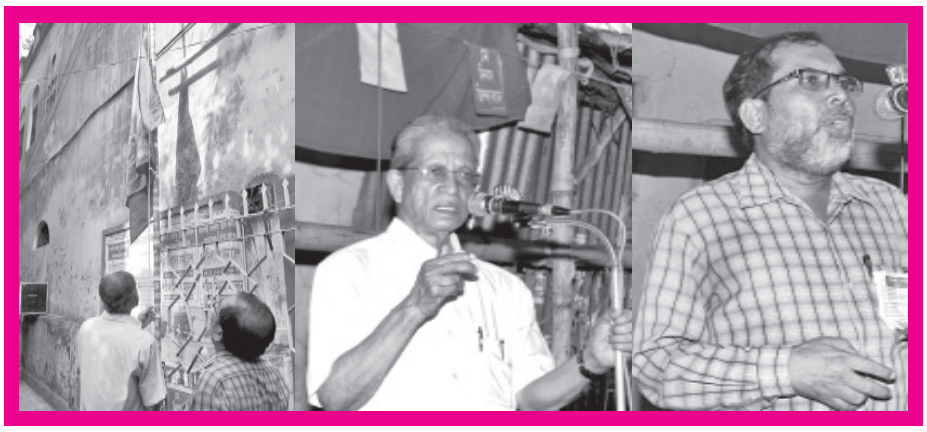

পতাকা উত্তোলনে অশোক পাত্র | বক্তা : সুকোমল সেন | বক্তা : অসিত ভট্টাচার্য

প্রতি বছরের ন্যায়, এবছরেও যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্য দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদর দপ্তর শাঁখারিটোলা স্ট্রিটে ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হয়। তীব্র দাবদাহের মধ্যেও সভাস্থলে ব্যাপক সংখ্যক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও রক্তপতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন, যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য্য। মে-দিবসের ইতিহাস এবং বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি। মূল বক্তব্য রাখেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সুকোমল সেন। তিনি আট ঘণ্টা কাজের দাবির আন্দোলন, শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ঘটনা, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে এদেশের শ্রম আইনের ওপর কীভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে—সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। একই সাথে বর্তমান রাজ্য সরকার কর্তৃক শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের সর্বোচ্চ হাতিয়ার ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অপপ্রয়াসেরও তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা আদায়ের দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। □

সমিতি/অঞ্চলে মে দিবস প্রতিপালিত

সমিতি ভবনের (৭১, সার্পেন্টাইন লেন) স্বল্প পরিসরেই ঐতিহাসিক মে দিবসের ১২৬তম বার্ষিকী সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হল। সমিতি ভবনে অবস্থিত ১২টি সমিতির উদ্যোগে ১ মে ২০১৫ বেলা ১.৩০ টায় মে দিবস পালনের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও লাল আলো ও চেন পোস্টারে সমিতি ভবনটি সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

সভার শুরুতে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সভার সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস। তিনি শহীদ বেদীতে মাল্যদান করার পর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধি তথা সহ-সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনহা শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। এরপর তত্ত্বাবধায়ক কমিটির আহ্বায়ক সহ অন্যান্য সমিতিগুলির নেতৃবৃন্দ শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন।

তত্ত্বাবধায়ক কমিটির পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের চিত্তরঞ্জন মণ্ডল প্রাথমিক বক্তব্য পেশ করেন। এরপর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি বিজয় শঙ্কর সিনহা মে দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি আগামী সংগ্রামের অভিমুখ তুলে ধরেন।

এই 'অনুষ্ঠানে' প্রায় ১৫০ জন এর অধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সমিতি ভবনের অনুষ্ঠানের শেষে সকল সদস্য কর্মচারী ভবনের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ও পরবর্তীতে মিছিল করে শহীদ মিনারের সমাবেশে যোগদান করে মে দিবসের কর্মসূচীকে সফল করে তোলেন। □

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ১১-১২ মে, ২০১৫ মহারাষ্ট্রের নাসিকে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আর জি কার্নিককে সভায় সংবর্ধনা জানানো হয়। মহারাষ্ট্র স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ কনফেডারেশন সভার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল। সংগঠনের প্রশিক্ষণকেন্দ্র ভবনের মাহে আচরেকর সভা গৃহে—দু'দিন ব্যাপী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটি সভার প্রারম্ভে সাধারণ সম্পাদক শহীদদের উদ্দেশে স্মরণ করে একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং ১ মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপরে মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেত্রী প্রতিমা সোনায় অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পরে সুনিল যোশীও বক্তব্য রাখেন। আর জি কার্নিক মহারাষ্ট্রের কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতির উপর বক্তব্য রাখেন।

সভার মূলপর্বে শুরুতে নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। শ্রীকুমার প্রতিবেদন পেশ করেন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক, জাতীয় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন দেশের বি জে পি সরকার উদারনীতি স্বৈরাচারের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করছে। শ্রমিক, কর্মচারী কৃষক সমাজ তথা শ্রমজীবী মানুষ দারুণ ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। আর্থিক সংস্থাগুলি ব্যাংক, বীমা, প্রতিরক্ষা ও পেনশন ব্যবস্থা বেসরকারীকরণ করেছে, কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছে না আত্মহত্যা করছে কোনো হেলদোল নেই, এছাড়া শ্রমিক-কৃষকের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য শ্রম আইন সংশোধন ও জমি অধিগ্রহণ বিল আনার প্রক্রিয়া জারি রেখেছে। শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশে আইন অমান্য আন্দোলন সহ সংগ্রাম আন্দোলন হচ্ছে, আগামী ২৬ মে, ২০১৫ দিল্লীতে ১৫টি সর্বভারতীয় সংগঠনের আহ্বানে জাতীয় কনভেনশন থেকে বৃহত্তর কর্মসূচীর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে তহবিল সংগ্রহের আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া দাবি-দাওয়া ও অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মসূচীর বিষয়গুলি প্রস্তাবাকারে সভায় রাখা হয়।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার উপর ও মহিলা সেশন সহ ৭ জন মহিলা ও ২২ জন পুরুষ সদস্য প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কার্যনির্বাহী সদস্যদের গঠনমূলক আলোচনার উপর জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার। শেষে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সংগঠনের সিনিয়র ভাইস্ চেয়ারম্যান সুকোমল সেন সংক্ষিপ্ত বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

দাবি উত্থাপনের অভিনব কর্মসূচী

নীরবতাও যখন বাঙ্ময়

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। রাজ্য কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন। অপ্রতিরোধ্য গতিই যার বৈশিষ্ট্য। যে কোনো পরিস্থিতিতে রাজ্য কর্মচারী, বৃহত্তর পরিসরের শ্রমিক-কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধ পরিকর। ১৯৫৬ সালে পথচলা শুরু। শুরুর দিন থেকেই সংগঠন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে কিভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভেদ করে অগ্রসর হওয়া যায়। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চূড়ান্ত কর্মচারী স্বার্থবিরোধী প্রশাসন, শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস কোনো কিছুই দমাতে পারেনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে। প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি আর আত্মত্যাগ স্বীকার করেও কর্মচারী স্বার্থে জান কবুল লড়াই করেছে সংগঠন। তারপর ৩৪ বছর বামফ্রন্টের শাসন। কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে পরিচালিত প্রশাসন, প্রশাসনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ। অনুকূল পরিস্থিতিকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে কর্মচারী স্বার্থবাহী বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণে, আদেশনামা প্রকাশে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, অধিকার সমৃদ্ধ হয়েছে, মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কর্মচারী সমাজ।

তারপর...। আবার অন্ধকার নামছে রাজ্য প্রশাসন জুড়ে। আর্থিক অবস্থার অবনমন ঘটছে। অধিকার ও মর্যাদা বিপন্ন। আবারও পথে নেমে প্রতিবাদ করছে সেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যতগুলি পদ্ধতি স্বীকৃত, সমস্ত পদ্ধতিকে ব্যবহার করেই গড়ে তোলা হচ্ছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-আন্দোলন। চলছে বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রস্তুতি। এরই মধ্যে এক অভিনব কর্মসূচীতে শামিল হলেন কর্মচারী সমাজ। প্রশাসনের কাজকে (যা মানুষের কাজ) বিন্দুমাত্র বিঘ্ন না ঘটিয়ে, বুকে দাবি পোস্টার লাগিয়ে তিনদিন ধরে চলল নীরব প্রতিবাদ (৫-৭ মে)। নবান্ন থেকে শুরু করে ব্লক স্তর পর্যন্ত গোটা রাজ্য জুড়ে কয়েক হাজার কর্মচারী বুকে দাবি সম্বলিত বডি পোস্টার লাগিয়ে কাজ করে গেলেন। যা ছাপা হয়েছিল, চাহিদা ছিল তার থেকেও অনেক বেশি। তাই বহু কর্মচারী ইচ্ছে থাকলেও বডি পোস্টার পরার সুযোগ পেলেন না। কিন্তু তাঁরাও এই কর্মসূচীকে সমর্থন করলেন সোচ্চারে। ৮ মে প্রতিটি জেলায়, অঞ্চলে একাধিক স্থানে ব্যাপক কর্মচারী জমায়েতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল বিক্ষোভ সমাবেশ। বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন হাজার হাজার কর্মচারী।

৮ মে মধ্যাঞ্চলে বিক্ষোভ সভা

কোচবিহার ঃ জেলার ১০টির মধ্যে ৯টি ব্লকে ও ৪টি মহকুমায় তিন দিন ধরে উক্ত কর্মসূচী পালিত হয়। গড়ে ব্লকগুলিতে (২০-২৫) এবং মহকুমাগুলিতে (৬০-৭০) জন অ্যাপ্রন পরিধান করে। ৮ তারিখের বিক্ষোভ কর্মসূচী ব্লকগুলিতে করা না গেলেও ৪টি মহকুমায় তা অনুষ্ঠিত হয়। সদরের ৪টি অঞ্চলে গড়ে (৪০-৪৫) জন অ্যাপ্রন পরিধান করে ও জেলা কালেক্টরেট দপ্তরে ৮ তারিখ বিক্ষোভ সমাবেশে প্রায় ২০০ জন কর্মচারীর উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক আশীষ গোস্বামী।

জলপাইগুড়ি ঃ জেলার ৯টি ব্লক ও ৩টি মহকুমায় কর্মসূচী পালিত হয়। ব্লকগুলিতে গড়ে (২৫-৩০) ও মহকুমাগুলিতে (৫০-৬০) জন ও সদরের ৫টি অঞ্চলে মোট ২০০ জন অ্যাপ্রন পরিধান করে। ৮ তারিখ জেলার ২২টি জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। জেলা কালেক্টরেট দপ্তরে এই বিক্ষোভ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১০০ জন কর্মচারী।

দার্জিলিং ঃ জেলার শুধুমাত্র শিলিগুড়ি মহকুমাতেই এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হয় যাতে ৮০০ জন কর্মচারী অ্যাপ্রন পরিধান করেন। মহকুমার প্রতিটি দপ্তরেই ৮ মে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিস্তা ব্যারেজ প্রজেক্টে ৬০ জন কর্মচারীর উপস্থিতিতে সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নারায়ণ মজুমদার ও মেডিক্যাল কলেজে ৪২ জন কর্মচারী বন্ধুর উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন সভানেত্রী মলিনা হালদার।

উত্তর দিনাজপুর ঃ জেলার ৭টি ব্লক ও ২টি মহকুমার ৯টি সেক্টরে কর্মসূচীটি প্রতিপালিত হয়, ব্লকগুলিতে গড়ে (২০-২৫) জন ও সেক্টরগুলিতে মোট ২০০ জন অ্যাপ্রন পরিধান করে। ৮ মে-র কর্মসূচী ৫টি ব্লক ও ৯টি সেক্টরের ৩টি পয়েন্টে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কালেক্টরেট দপ্তরের এই বিক্ষোভ কর্মসূচীতে ২০০ জন কর্মচারীর উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক দীপক চ্যাটার্জী।

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেলার ৬টি ব্লকের মধ্যে ২টি ও ১টি মহকুমায় কর্মসূচীটি প্রতিপালিত হয়। সদরে ৫টি অঞ্চলে গড়ে (৯০-৯৫) জন অ্যাপ্রন পরিধান করে। ৮ মে-র বিক্ষোভ সমাবেশে জেলা কালেক্টরেট দপ্তরে (১৭০-১৭৫) জন কর্মচারীর উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মন্ডল।

মালদা ঃ জেলার ১৪টি ব্লক (গড়ে ৫-১০ জন ১টি মহকুমা (গড়ে ২৫ জন) ও সদরের ৭টি অঞ্চলে গড়ে ৪০ জন কর্মচারী অ্যাপ্রন পরিধান করে। ৮ মে-র বিক্ষোভ কর্মসূচী ৮টি ব্লক ও ১টি মহকুমায় অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কালেক্টরেট দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচীতে (৪২-৪৩) জন কর্মচারীর উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন জেলা সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রমাপদ চ্যাটার্জী।

মুর্শিদাবাদ ঃ জেলার ২১টির মধ্যে ২০টি ব্লক ও ৩টি মহকুমায় কর্মসূচী পালিত হয়। মহকুমা ও সদরের ৬টি অঞ্চলে গড়ে (১৫-২০) জন অ্যাপ্রন পরিধান করে। ৮ মে-র বিক্ষোভ কর্মসূচী দপ্তরগুলিতে পালিত হয় যেখানে জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরে (৬০-৭০) জন কর্মচারীর উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন অঞ্চলের আহ্বায়ক।

বীরভূম ঃ জেলার ১৯টির মধ্যে ১৫টি ব্লকে ও ৩টি মহকুমায় কর্মসূচী পালিত হয়। সদরের ৬টি সেক্টর সহ

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
মে ২০১৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৪ তম বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

‘এক’ ও ‘চার’-এর সাঁড়াশি আক্রমণ

‘এক এবং ‘চার’। গণিতের একক ঘরের দুটি অঙ্ক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে এই দুটি অঙ্ক আর শুধু গাণিতিক তাৎপর্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রবল ভারি হয়ে রাজ্যবাসীর ঘাড়ে চেপে বসছে। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে হেঁয়ালির মতো শোনালেও একটু গভীরে গিয়ে ভাবলে ঐ দুটি অঙ্কের বৃহত্তর তাৎপর্য অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। হেঁয়ালির সমাধান সূত্র হিসেবে বলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে ‘এক’ ও ‘চার’ উভয়েই সময় বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে বছর-এর দ্যোতক। অর্থাৎ একবছর ও চার বছর। এখন ভাব সম্প্রসারণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলিকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে—‘এক বছর ও চার বছর পৃথকভাবে এবং যৌথভাবে রাজ্যবাসীর কাঁধে ভারি বোঝার মতো চেপে বসছে।’ ব্যাখ্যা শুরু করা যাক। এক বছর ও চার বছর বলতে এখানে দুটি সরকারের স্থায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ২৬ মে ২০১৪ কাজ শুরু করার পর এক বছরে পা দিয়েছে দিল্লীর সরকার। অন্যদিকে ২০ মে ২০১১তে কাজ শুরু করে চার বছরে পা দিয়েছে রাজ্যের সরকার। উভয় সরকারই বিপুল সমারোহে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যথাক্রমে এক বছর ও চার বছর পূর্তি উৎসবের আয়োজন করেছে। সরকারী অর্থে অর্থাৎ জনগণের করের টাকায় ‘মোচ্ছব’ করার ব্যাপারে এবং নিজেদের ঢাক নিজেরাই পেটানোরে কাজে এই দুই সরকারের দক্ষতাই প্রশ্নাতীত। ফলে জনসাধারণের চোখের সামনে এখন শুধুই বিজ্ঞাপনের হরির লুট চলছে। পরিস্থিতি এমনই যে, কার সাফল্যের তালিকা দীর্ঘতর তা নিয়ে টেলিভিশন চ্যানেলের প্রাইম টাইমে ‘বিদ্বজ্জনের’ বিতর্ক সভা বসানো যেতেই পারে। তবে আমরা নিশ্চিত ঐ বিতর্কে অংশগ্রহণকারী ভাড়াটিয়া বিতার্কিকদের মগজাস্ত্র যতই ধারালো হোক বা কণ্ঠস্বরকে সপ্তগ্রামে চড়ানোর মুন্সিয়ানা যতই তাদের থাকুক, বিতর্কের ফলাফল অসীমাংসিত থাকতে বাধ্য। কারণ উভয় পক্ষই সাফল্যের খতিয়ান পেশ করতে গিয়ে গল্পের গরুকে গাছের মগডাল পর্যন্ত তুলবেই। মগডাল পর্যন্তই, কারণ তারও উপরে তোলার ইচ্ছে থাকলেও কোনও উপায় বা সুযোগ যে নেই। দুটি সরকারই নিজেদের সাফল্যের খতিয়ান যতই হাজির করুক, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কি বলছে। মানুষের অভিজ্ঞতার নিরিখে এই দুটি সরকারের ভূমিকা যাচাই করে যদি নম্বর দেওয়া হয়, তাহলে দুটি সরকারের কেউই কি আদৌ পাশ করতে পারবে? নিশ্চিতভাবেই না।

মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই মূল্যায়ণ করা সঠিক প্রক্রিয়া। কারণ দুটি সরকারই মানুষের বিপুল সমর্থন নিয়ে নির্বাচিত হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যেকোনো কারণেই হোক, এই দুটি সরকারকে বর্তমানে যে রাজনৈতিক শক্তিগুলি পরিচালনা করছে তাদের ওপর প্রবল ভরসা করেছিলেন। অবশ্য এই ভরসা কতটা স্বতঃৎসারিত এবং কতটা কৃত্রিমভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। তবে ভরসা যখন মানুষ করেছিলেন, তা যেকোনো কারণেই হোক, তাকে মূল্য দেওয়া, সেই অনুযায়ী ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা নির্বাচিত সরকারের কর্তব্য হওয়া উচিত। জনগণের মধ্যে থেকে উঠে এসে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে জনগণের স্বার্থে কাজ করাই তো গণতন্ত্রের মর্মবস্তু। উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি দেখে মনে হয়েছিল, নির্বাচিত হলে প্রতিশ্রুতি পালনে কেন্দ্র ও রাজ্যের নয়া অধীশ্বরেরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঝাঁপিয়ে তারা পড়েছে বটে, কিন্তু তা কতটা মানুষের জন্য কতটা প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের তাগিদে বা প্রাক্-নির্বাচনী কোনো ‘লুক্কায়িত’ এজেন্ডাকে কার্যকরী করার জন্য কিনা-এসবই আজকের আলোচনার বিষয়। মূল্যায়ণ হওয়া উচিত তার ভিত্তিতেই।

এই দুটি সরকারের ঘোষিত কর্মপদ্ধতির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণের ভান করা হলেও বেশ কিছু চারিত্রিক সাযুজ্য রয়েছে। যা অনেক সময় খোলা চোখেও ধরা পড়ে। গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। রয়েছে, সিংহ দরজায় দাঁড়িয়ে গলা তুলে ঝগড়া করে খিড়কির দরজা দিয়ে ‘হাতে হাতে ধরি ধরি’ মিতালি করার ঝোঁকও। এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করার আগে, দুটি সরকারের ভূমিকার পৃথক মূল্যায়ন করাটাও জরুরী। কারণ সাংবিধানিক ক্ষমতা বিভাজন নীতি এই দুটি সরকারের কাজের ভিন্ন ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়েছে, অবশ্য ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও পরস্পর সম্পর্কিত, সম্পর্ক রহিত নয়। মূল্যায়ণের সময় মাথায় রাখা দরকার সংবিধানের এক-কেন্দ্রীক ঝোঁকের জন্য কেন্দ্রের ওপর রাজ্যের কিছুটা নির্ভরশীলতাও রয়েছে। বিশেষত রাজস্বের প্রশ্নে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস-এর প্রশ্নে রাজ্য সরকারের নীতিগত অবস্থান কি, কেন্দ্রে জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার নীতিনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করছে কিনা, নাকি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছে—এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা উচিত।

‘সুদিন’ আনার, ঘোষিত প্রতিশ্রুতি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। সাধারণ মানুষের জন্য সুদিন। শুধুমাত্র আদানি, আম্বানি সহ কর্পোরেট জগতের জন্য নয়। কর্পোরেট কর্তাদের জন্য নতুন করে সুদিন আনার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। কারণ তারা আছেই বহাল তবিয়তে। তা সাধারণ মানুষের সুদিন এর নিদারুণ অভিজ্ঞতা কি বলে? কৃষকের ‘মন কি বাত’ শুনে কেন্দ্রীয় সরকার এতটাই বিচলিত যে ২০০৩ সালে প্রণীত জমি আইনে কৃষকের জন্য যতটুকু রক্ষা কবচ ছিল, প্রস্তাবিত সংশোধিত আইনে তাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ যখন খুশি যেভাবে খুশি কৃষককে তার জমি থেকে জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করা যাবে। সংসদের উচ্চকক্ষে সংখ্যাগত জটিলতার জন্য বিল পাশে বিলম্ব হচ্ছে। তর সইছে না কেন্দ্রীয় সরকারের। তাই অর্ডিন্যান্স করেই তড়িঘড়ি এগোতে চাইছে সরকার। শুধু জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ভয়টাই একমাত্র বিষয় নয়। কৃষকের ফসল ফলানোর জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সবগুলিই অতি মহার্ঘ কারণ কেন্দ্রের সরকার সমাজের বৃহত্তম এই অংশটির (নির্বাচকমণ্ডলীরও বৃহত্তম অংশ) জন্য কোনোরকম দায় নিতে নারাজ। কৃষকের জন্য সুদিন??

সমাজের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ ‘শ্রমিক’। সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে, ছোট, মাঝারি, বড় মাপের সংস্থায়। এমনকি কৃষি কাজেও যুক্ত রয়েছে শ্রমিক। এদের ‘সুদিন’-এর কি খবর? সংগঠিত হওয়া বা যৌথ দর কষাকষির যতটুকু অধিকার এদের ছিল, শ্রম আইনের সংস্কার করে তাও কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা, প্রকৃত মজুরি হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার অবলুপ্তি প্রভৃতি শ্রমিকের নিত্যসঙ্গী। একেই কি ‘সুদিন’ বলা হয়েছিল?

দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বয়স ১৮-৩০ বছর। যুব সমাজ। দুহাতে কাজ চাইছে। মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী অথবা কায়িক শ্রমের কাজ। অথচ কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশই সঙ্কুচিত হচ্ছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রাথমিক শর্তই হল সরকারকে এগিয়ে এসে পরিকাঠামো ও বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে। তাহলে সরকারই হতে পারে আদর্শ নিয়োগ কর্তা। কিন্তু আমাদের দেশের ‘আচ্ছে দিন’-এর সরকার নিজেরা বিনিয়োগে আগ্রহী নয়। তারা আগ্রহী বিদেশী বিনিয়োগের জন্য। অনেক বেশি আগ্রহী দেশেরমাটির নিচের ও ওপরের সমস্ত সম্পদকে দেশী-বিদেশী মুনাফাখোরদের হাতে বেচে দিতে। এমনকি ‘রেগা’-র মতো পৃথিবীর বৃহত্তম কর্মসংস্থান প্রকল্পটিও গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে। একে কি বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ‘সুদিন’ বলা যাবে? কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরে নিয়োগ বন্ধ। বেসরকারীকরণের পথে রেল, ব্যাঙ্ক, বীমা, প্রতিরক্ষা। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন পরিষেবা ক্ষেত্রের কর্মচারীরা। একে কি মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের ‘সুদিন’ বলা যাবে? অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কারণে ধূমায়িত মানুষের ক্ষোভকে বিপথে চালিত করার জন্য, বিভাজনের নীতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। ধর্ম, জাত-পাত ও লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের রাজনীতির দাপাদাপিতে দীর্ণ-বিদীর্ণ সমাজ। এমনকি আর্থিক দিক থেকে নিরাপদ মানুষও সামাজিক দিক থেকে নিরাপদ নন। কোনোভাবেই কি একে ‘সুদিন’ বলা যাবে?

তথৈবচ অবস্থা রাজ্য সরকারেরও। সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। কি পেয়েছি আমরা গত চার বছরে? কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে, করছে। রাজ্য সরকার নির্বিকার। রাজ্যে কোনো নতুন শিল্প হচ্ছে না, পুরানো শিল্প পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলছে। রাজ্য সরকার ব্যস্ত শিল্প মহলকে খুশি করতে ভোজসভার আয়োজনে। রাজ্য সরকারের বেতনভুক সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রাপ্তির ভাড়ার শূন্য। অধ্যাপক, শিক্ষকেরা আত্মসম্মান নিয়ে কাজ করার পরিবেশ পাচ্ছেন না। প্রতিদিন ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে নারীদের সম্মান। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উবে যাচ্ছে ‘গণতন্ত্র’। প্রতিবাদ করলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে সরকারী পুলিশ আর বেসরকারী গুণ্ডা বাহিনী। দুর্নীতির শিরোপা মাথায় নিয়ে চলছে সরকার। সোনার বাংলার চেহারাটা কি এমনই?

উপরোক্ত অভিজ্ঞতাগুলির নিরিখে মূল্যায়ন করলে কত নম্বর দেওয়া যেতে পারে দুটি সরকারকে?

এবারে আসা যাক মিল-অমিল ও মিতালির প্রসঙ্গে। দুটি সরকারেরই মুখ্য সাদৃশ্য হল—সরকার দুটি চলে দু’জন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যে বাকিরা যারা মন্ত্রিসভা আলো করে বসে আছে, তারা কার্যত কলের পুতুল। প্রথম দিকে এই দুই সরকারের বেশ অহি-নকুল সম্পর্ক মনে হচ্ছিল। একে অপরকে গাল না দিয়ে দিন শুরু হত না। বিশেষ করে রাজ্যের দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্র তো যেন পারলে গিলেই ফেলে। একজন যদি হন সংখ্যাগুরুদের মসিহা, অপরজন সংখ্যালঘুদের। এক কথায় আই পি এল মার্কা রেশারেশি যেন রাজনীতির মাঠে। মিডিয়াও উদ্বাহু। দ্যাখ দ্যাখ এরাই আছে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে, বামপন্থীরা নেই। বামপন্থীরা প্রতিদিন রাস্তায় অথচ তারা বিকল্প নয়। মূলত বিকল্প নাকি তারাই যারা বিবৃতির নারদ-নারদ মার্কা ঝগড়া করছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা গেল কাণ্ডজে আগ মার্কা বিরোধিতাও কেমন মিইয়ে গেছে। দুর্নীতির প্রসঙ্গও ধামা চাপা। ‘চায়-পে-চর্চাকে’ এতদিন নীল-সাদা হাওয়াই চটি বয়কট করেছিল। বয়কট আন্দোলন শেষ। এখন হাতে হাতে ধরি ধরি মিতালি দিল্লী থেকে বাংলা দেশ। মিডিয়ার জ্যাঠামশাই কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলেছে। কি বলবে, কি বলবে না বুঝে উঠতে পারছে না। কিন্তু যাই হোক একটি সিদ্ধান্তে ওরা অটল, বামপন্থীদের বাড়তে দেওয়া যাবে না। তবে বামপন্থীরা কখনোই ওদের ভরসায় রাস্তায় নামেনি। নেমেছে মানুষকে সাথে নিয়ে। এবারও তাই হবে। হতে শুরুও করেছে। □

১ জুন, ২০১৫

শোক সংবাদ

প্রয়াত কমরেড বিপ্লব দে সরকার

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলন তথা সারা রাজ্যের গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের নেতা, পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বিপ্লব দে সরকার গত ১৭ মে, ২০১৫ রাত্রি ৯টা নাগাদ সোদপুর স্টেশন থেকে অটোরিক্সায় বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন, স্থানীয় মানুষের সহায়তায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রাত ১০.২০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে কমরেড বিপ্লব দে সরকারের বয়স হয়েছিল ৬১ বছর, তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, এক পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, এক কন্যা, জামাতা, নাতনি সহ রাজ্যের অগণিত সহযোদ্ধা বন্ধুদের।

কমরেড দে সরকার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের ‘পাবনা’ জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার বরদুল গ্রামে ১৭ই জুলাই ১৯৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম প্রমথ নাথ, মাতার নাম কালিতারা। দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পিতা মাতার তৃতীয় সন্তান। পাবনা জেলার রূপসী গ্রামের পাঁচপারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের শাসক বাহিনীর অমানবিক, পাশবিক আক্রমণে নিরাপত্তাহীনতায় ১৯৬৭ সালে পিতা মাতার সঙ্গে অন্যান্য আত্মীয়দের সহায়তায় পায়ে হেঁটে সর্বস্বান্ত অবস্থায় চাকদহে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কানাইলাল দে সরকারের আশ্রয়ে ওঠেন।

এই সময় থেকেই তাঁর জীবন সংগ্রামে নুতন করে পথ চলা শুরু হয়। এর মধ্যে তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পারিবারিক দায়বদ্ধতার কারণে স্বল্প বয়স থেকেই কাজের চেষ্টা করতে থাকায় পরবর্তী শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে ছেদ ঘটে। ১৯৭৩ সালে বাউরিয়াতে ফোর্ট গ্লাষ্টার নর্থ মিলে শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করেন।

১৯৭৪ সালে অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলায় বাসন্তী ব্লকের জে. এল. আর. ও. অফিসে দৈনিক মজুরীতে পাঙ্খাপুলার পদে যোগদান করেন। দৈনিক মজুরীতে কাজ করার সময় সংগঠনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯ সালে অস্থায়ী কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে ১৭০০ ই.এম.পি. আদেশনামা প্রকাশ করলে ১৯৮২ সালের ৭ জুলাই বাসন্তী জে.এল.আর.ও. অফিসে পিওন পদে স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন। স্থায়ী পদে যোগদানের পূর্ব থেকে সংগঠনের সাথে যোগাযোগ থাকায় তিনি অচিরেই কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের ব্লক ও মহকুমাস্তরের কর্মচারীদের সংগঠিত করার কাজে যুক্ত হন।

১৯৮৬ সালে অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলা সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। জেলা ভাগের পর তিনি বারাসত কালেক্টরেটে বদলী হয়ে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি সমিতির উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। কমরেড দে সরকার সমিতির ৩৬তম সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, ৩৮তম রাজ্য সম্মেলনে যুগ্ম সম্পাদক, সমিতির ৪১তম রাজ্য সম্মেলন থেকে সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। তিনি দীর্ঘ ১২ বছর রাজ্যে কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

কমরেড দে সরকারের বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলী ছিল, সংগঠনের যে কোন পরিশ্রমের কাজ, কর্মচারীদের সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছিল অনুকরণীয়। গ্রুপ-ডি কর্মচারী হলেও প্রশাসনিক কাজও তিনি দক্ষতার সাথে করতে পারতেন। শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি কমরেড বিপ্লব দে সরকারের ছিল গভীর আস্থা, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই আস্থা অটুট ছিল এবং সেই আদর্শকে বুকে ধারণ করে কর্মচারীদের সংগঠিত করার কাজ করে গেছেন।

কমরেড বিপ্লব দে সরকার বসবাসের এলাকাতেও ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় মানুষ। এলাকার পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে এলাকাবাসীদের সংগঠিত করে সজল ধারা প্রকল্প চালু করেন। এছাড়াও এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে বাসস্থান এলাকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

গত ২৯ মে ২০১৫ তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এই স্মরণসভায় স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন প্রশান্ত সাহা, কমলকৃষ্ণ দে সরকার, মনোজকান্তি গুহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। □

অরুণা শানবাগ

এই সমাজ, এই দেশ, এই ব্যবস্থায় তিনি মর্যাদার সাথে বেচে থাকার অধিকার পাননি। পাননি ন্যায় বিচারও। পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়ে গোটা জীবনটাই কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন। ৪২ বছর আগে বলা যেতে পারে খুন হয়েছিলেন।

গত ১৮ মে সোমবার মুম্বাইয়ের কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালে অরুণা শানবাগের মৃত্যু হয়েছে।

এই হাসপাতালে চার দশক আগে জুনিয়র নার্স হিসাবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। অরুণা শানবাগ চলে গেলেন। কিন্তু রেখে গেলেন এক জ্বলন্ত প্রশ্ন। নারীদের সমানাধিকার, মর্যাদাকে কবে স্বীকৃতি দেবে এই সমাজ? □

রক্তদান কর্মসূচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত অন্যতম সংগঠন ‘পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন’-এর স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী ১৪ই মে, ২০১৫ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন অডিটোরিয়াম হল এবং নব মহাকরণ ক্যান্টিন হলে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে ব্লাড ব্যাঙ্কে যখন রক্তের অভাব দেখা যায় সেই সময়েই এই সংগঠনের উদ্যোগে মহামতি লেনিন-এর জন্মদিবস (২২ এপ্রিল)-কে স্মরণ করে সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে রক্তদান কর্মসূচী পালিত হয়। এই বছর স্বাস্থ্য ভবন অডিটোরিয়ামে লবণ হ্রদ, পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের ৭১ জন কর্মচারী (৩ জন মহিলা সহ) এবং নবমহাকরণ ক্যান্টিন হলে মহাকরণ, নব মহাকরণ, মধ্যাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল ও হাওড়া অঞ্চলের ৫৭ জন কর্মচারী (১জন মহিলা সহ) রক্তদান করেন।

স্বাস্থ্যভবন অডিটোরিয়াম হলে প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত সভায় এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শিখা মুখার্জী এবং নব মহাকরণ ক্যান্টিন হলে কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার-এর সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য্য। এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং অগণিত সাধারণ রাজ্য সরকারী কর্মচারী। □

মোদি সরকারের একবছর
বিপজ্জনক প্রবণতার কিছু দিক

কেন্দ্রে মোদি সরকারের বছর পূর্তিতে আহ্লাদিত মোদিজী স্বয়ং বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে এক মাসের মধ্যে দুবার প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বলেছেন যে এক বছর আগে তাঁরা ভারতীয় হয়ে জন্মানোর জন্য লজ্জাবোধ করতেন, কিন্তু এখন তাঁরা দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে গর্ববোধ করছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে স্বদেশবাসীর প্রতি এহেন অমর্যাদাকর মন্তব্য মেগালোম্যানিয়ার লক্ষণ বহন করছে কিনা ভাবতে হবে, কিন্তু মাত্র এক বছর আগে কর্পোরেট স্বার্থে তাবৎ মিডিয়া যেভাবে ব্যক্তিনির্ভর 'মিথ' তৈরি করে জনমনে আবেগোচ্ছ্বাস সৃষ্টিতে নেমে পড়েছিল, সেই 'সুবাতাস' এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে, একথা বলতেই হবে। মিডিয়ার গড়ে তোলা 'মিথ' নিজের ওপর আরোপণ করে প্রধানমন্ত্রীজী নিজেকে 'অতি মানব' হিসেবে জনমানসে হাজির করতে চাইছেন। কিন্তু জনগণের মনের গতিপ্রকৃতি হাওয়ামোরগের মতো যারা নির্দেশ করতে পারে সেই মিডিয়া প্রমাদ গণেছে এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো কর্পোরেট স্বার্থের যূপকাষ্ঠে দেশের স্বার্থকে বলি দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তারা সরকারের সমালোচনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে বহু ক্ষেত্রেই। না হলে, জনগণের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাই থাকে না!

এই একটা বছর এদেশের সাধারণ গরিব-মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষ, প্রগতিশীল চিন্তার বিবেচক মানুষেরা কিন্তু নিজেদের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছেন 'আচ্ছে দিন' নয় 'বুরে দিন' নেমে এসেছে দেশের বুকে। পাঁচ বছর মেয়াদের প্রথম বছরেই মোদি সরকারের 'সাফল্য'র বহর দেখে তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ! আর যাই হোক, সরকারী প্রচারের রমরমানিতে তো আর মানুষের পেট ভরে না।

মোদি সরকারের প্রথম শিকার শ্রমিকরা

কর্পোরেট জগৎ মোদির ওপর নির্বাচনের আগে যে ভরসা করেছিল, নির্বাচনের পরে ক্ষমতায় আসীন হওয়া মাত্রই শিল্পপতিমহলের দীর্ঘদিনের সংস্কারের দাবি পূরণ করতে সংস্কারের নতুন পর্যায় সরকার শুরু করে দেয় অক্টোবর, ২০১৪ তেই। যে দেশে বিপুল পরিমাণ বেকারবাহিনী মজুত রয়েছে, সেখানে যখন এমনিতেই যৎসামান্য মজুরীতে, মনুষ্যেতর পরিবেশের মধ্যে শ্রমিকরা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও শ্রম আইন সংস্কার করে সরকার শ্রমিকদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনী সুরক্ষার অধিকারটুকু কেড়ে নিতে এত তৎপর কেন? উত্তরটা আমাদের সকলেরই জানা—মালিকদের অপ্রতিহত মুনাফার নিশ্চয়তা তৈরি করা।

এর প্রথম পদক্ষেপ হল Small Factories (Regulation of Employment and other Conditions of Service) Act. 2014। এই আইনের মধ্যে দিয়ে দ্য ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট, দ্য ই এস আই অ্যাক্ট, দ্য মেটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট, প্রভৃতি ১৬টি শ্রম আইনের আওতার বাইরে চলে যাবে সেইসব কারখানা যেখানে ৪০ জন পর্যন্ত শ্রমিক কাজ করে। সম্প্রতি শক্তিচালিত কারখানায় শ্রমিক সংখ্যার সর্বনিম্ন সীমা (ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, বলবৎ-এর) ১০ থেকে বাড়িয়ে ২০ এবং শক্তিচালিত নয়, এমন কারখানায় তা ২০ থেকে বাড়িয়ে ৪০ করার চেষ্টা হচ্ছে। এর ফলে দেশের ৬৫ শতাংশ কারখানার প্রায় ১২.৫ লক্ষ শ্রমিক ফ্যাক্টরি আইনের আওতার বাইরে চলে যাবেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট অনুযায়ী ১০০ জন শ্রমিক কাজ করেন এমন কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই করার আগে সরকারের অনুমতি নিতে হয়। বর্তমানে শ্রমিক সংখ্যার সর্বনিম্ন সীমা এক্ষেত্রে ৩০০ করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে ৯৩ শতাংশ কারখানাতেই মালিকরা অবাধে ছাঁটাই করতে পারবে। কন্ট্রাক্ট লেবার অ্যাক্টের সংশোধন করে সরকারী-বেসরকারী সমস্ত ক্ষেত্রে কর্মরত কনট্রাক্টরদের অধীনে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ হলে তবেই শ্রমিকরা আইনী সুরক্ষার আওতায় আসতে পারবে বলা হচ্ছে, আগে ঐ সীমা ছিল ২০ জন শ্রমিক। এসবের পরে শিল্পক্ষেত্রের যে অংশটুকু শ্রম আইনের আওতায় থাকবে তাদের ক্ষেত্রেও শ্রম আইন মেনে চলা সংক্রান্ত নথি মালিকই তৈরি করে সরকারের কাছে জমা দেবে, সরকারী নজরদারির ব্যবস্থা আর থাকবে না। এই স্বাধীনতাই চেয়ে আসছে এতদিন এদেশের শিল্প মালিকরা। শ্রমিক আন্দোলনের চাপে পূর্ববর্তী সরকারগুলি যা করতে পারেনি, সেটা করে মোদি সরকার যূপকাষ্ঠে শ্রমিকদের বলি দিতে চাইছে।

শিশু শ্রম আইন সংস্কারের ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা

সরকারের কুদৃষ্টি থেকে রেহাই পাচ্ছে না শিশুশ্রম নিরোধক এবং নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৬। এই আইন থাকা সত্ত্বেও ভারত

পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশু শ্রমিকের অগৌরব বহন করে। শিশু শ্রম আইনে সরকার যে সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেটে চূড়ান্ত করেছে সম্প্রতি, তাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিশুর অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনটি

শাশ্বতী মজুমদার

লঙ্ঘিত হচ্ছে। কারণ রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৮ বছরের কমবয়সীদের শিশু বলে অভিহিত করেছে, সেখানে এই সরকার ১৪-১৮ বছর পর্যন্ত সময়কে 'বয়ঃসন্ধিকাল' বলে উল্লেখ করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছাড়া অন্য কাজে তাদের লাগানো যাবে বলেছে, এমনকি ১৪ বছরের কমবয়সীদেরও পারিবারিক ইউনিটে কাজে ব্যবহার করার সুযোগ করে কম মজুরীতে চুক্তি শ্রমিক হিসাবে তাদের অবাধে খাটানোর বৈধ রাস্তা করে দিতে চাইছে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখে 'শ্রমযোগী' কথাটা ঠাট্টার মতো শোনায়

আই এল ও-র ২০০৯-১০ সালের তথ্য অনুযায়ী এদেশে অ-কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ৮৩.৬ শতাংশ অস্থায়ী শ্রমিক নিযুক্তির মাধ্যমে হয়, যার মধ্যে ফর্মাল ও ইনফর্মাল উভয় সেক্টরের শ্রমিকই আছেন। এর সঙ্গে কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান যুক্ত করলে সারা দেশে অসংগঠিত শ্রমিক ৯৩ শতাংশ। এদের জন্য কোনো শ্রম আইনের সুরক্ষা নেই। এছাড়া বার্ষিক শিল্প সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমিক সংখ্যার মধ্যে গড়ে এক তৃতীয়াংশ চুক্তিভিত্তিক। এই শ্রমিকরা এমনকি সংগঠিত ক্ষেত্রেও স্থায়ী কর্মচারীদের সমতুল মজুরী বা সুযোগ সুবিধা পান না। ২০১২-১৩ সালের সমীক্ষায় দেখা যায় এদেশে শিল্পে ১০০ টাকা খরচ হলে, শ্রমিকদের মজুরী ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার জন্য ব্যয় হয় ২.১৭ টাকা। ১৯৮০ সালে মূল্য যুক্ত মোট উৎপাদন ব্যয়ে মজুরীর অংশ ছিল ২৬ শতাংশ। ২০১০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশে। অন্যদিকে মুনাফার ভাগ বেড়েছে—৫.৩ শতাংশ থেকে ২১.৩ শতাংশ। দেশের সম্পদে শ্রমিকদের ভাগ কি নিদারুণভাবে কমছে এতে স্পষ্ট, এরপরও শ্রমসংস্কারের আড়ালে মজুরী কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার দৌড়ে এগিয়ে যাবার অজুহাতে। কিন্তু প্রশ্ন, শ্রমিকদের লুঠ করে দেশ কি এগোবে?

সামাজিক ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে নির্লজ্জ উদাসীনতা

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অকর্মণ্যতা ধরা পড়ছে সামাজিক জনকল্যাণকর কাজগুলিকে অবহেলার মধ্য দিয়ে। বিগত ইউপিএ সরকারের সময় এক গুচ্ছ কেন্দ্রীয় আইন গৃহীত হয়েছিল, যেগুলির কেন্দ্রে ছিল মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকারের প্রসঙ্গ। এদেশের শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ লড়াই আন্দোলন থেকে উঠে আসা সেই দাবিগুলির আইনী স্বীকৃতি দিতে ইউপিএ সরকার বাধ্য হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রের একটি প্রসারিত রূপ ধরা পড়েছে। অরণ্যের অধিকার আইন, খাদ্য সুরক্ষা আইন, শিক্ষার অধিকার আইন, তথ্যের অধিকার আইন, জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন—এগুলি শুধুই দরিদ্র জনগণের জন্য আর্থিক সহায়তা বা সামাজিক সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য তৈরি হয় নি। ভারতের একজন দরিদ্রতম নাগরিককেও তার জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনগুলি পাওয়ার দাবি নিয়ে হাজির হবার এবং সরকারকে দায়বদ্ধ করার গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ জড়িত এগুলির সঙ্গে। অধিকারভিত্তিক এই আইনগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে পরিষেবা পৌঁছনো নিশ্চিতকরণে মানুষের অংশগ্রহণের অধিকার—যা প্রকৃতপক্ষে শাসনব্যবস্থার অংশীদার হওয়ার অধিকার হয়ে দাঁড়াতে পারে চেতনার বিকাশের কোনো পর্যায়ে। স্বচ্ছতার দাবি, প্রশ্ন করার অধিকার, হিসাব সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থার দাবি এভাবেই উঠে এসেছে। এই সরকার এই কাঠামোটি ভেঙে দিতে চেয়েছে—একদিকে প্রতিটি প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ ছাঁটাই করে, দ্বিতীয়ত, খাদ্য, জ্বালানি গ্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্যাশ ট্রান্সফার চালু করে। ক্যাশ ট্রান্সফার বাস্তবিক পক্ষে সরকারের কাছে 'ডোল' পাওয়ার সমার্থক ছাড়া বেশি কিছু নয়, নাগরিক অধিকারের সঙ্গে জড়িত নানা মাত্রার বিষয়গুলি এর মধ্যে ধরা দেয় না।

শূন্য ব্যালান্সের অ্যাকাউন্ট, বীমা প্রকল্পের চমক দিয়ে এই সরকার গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রকল্পগুলির ঘাটতি ঢাকতে পারবে না কিছুতেই। এমনকি, এই সরকার যদি ঐ সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হয়, তাহলে তাদের নিজেদের লক্ষ্য আদর্শ কি তাও তারা বলছে না কেন? আসলে, কোনো আইনের তোয়াক্কা না করে স্বেচ্ছাচারের পক্ষে প্রশ্নহীন আনুগত্য আদায় করাই এই সরকারের অভিপ্রায়। মানুষের দাবি, অধিকার সেক্ষেত্রে নিতান্তই গৌণ। সেই সরকারের আবার সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একজন মাত্র ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত। ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের কাছে এটাই সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঝোঁক হয়ে দেখা দিচ্ছে।

অতীতের সমস্ত সরকারের সাফল্যকে নস্যাৎ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার উদগ্র প্রচেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী গত বাজেট অধিবেশনের বক্তৃতায় যখন বলে ওঠেন—মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প বন্ধ করা হবে না বরং ঐ প্রকল্পটি কংগ্রেসের ভুলের একটি জীবন্ত উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরার জন্য চালিয়ে যাওয়া হবে। তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আপাতভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হেয় করতে চাইলেও, প্রধানমন্ত্রী আসলে হেয় করতে চাইছেন মানুষের অধিকার অর্জনের লড়াইকেই। যে মানুষ তাঁকে ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছে, তাদের প্রতি এই তাচ্ছিল্য স্বাধীন ভারতে আর কোনো প্রধানমন্ত্রী এভাবে দেখাতে পেরেছেন বলা শক্ত। এই অপমানের জবাবে সাধারণ মানুষ ভাবতেই পারেন—'হাতের কাছে ছিল হাতেমতাই, চুড়োয় বসিয়েছি তাকে', এবার চুড়ো থেকে পথে নামানোও আমাদেরই হাতে। □

(প্রথম অংশ)

শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীর ওপর প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ৫-৮ এপ্রিল ২০১৫ বকেয়া ৪৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, চুক্তি প্রথায় নিয়োগ কর্মচারীদের নিয়মিত কর্মচারীর ন্যায় ভাতা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং শূন্যপদে লোক নিয়োগ—এই চারটি দাবিকে সামনে রেখে যে অভিনব বডি পোস্টার পরিধানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল, তা রাজ্যের অপরাপর অংশের কর্মচারীদের সাথে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির সদস্যবৃন্দ সাফল্যের সাথে প্রতিপালন করেছে। ঘোষণা ছিল ৫-৮ তারিখ এই বডি পোস্টার পরিধান করা হবে এবং শেষ দিন অর্থাৎ ৮ তারিখ টিফিন বিরতির সময় গণ জমায়েতের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটবে। সারা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে কয়েকশত সদস্য এই বডি পোস্টার পরিধান কর্মসূচী প্রতিপালন করেছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে এই জেলার বিভিন্ন স্থানে ৮ তারিখ টিফিনের সময় জমায়েত অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সমস্ত জমায়েতে কর্মচারী-সদস্যদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেই অনুযায়ী আলিপুর সদরের প্রশাসনিক ভবনের সামনে ৮ এপ্রিল জমায়েতের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই অঞ্চলে নব কোষাগার ভবনে ভূমি সংস্কার দপ্তরের মহকুমা ও জেলা অফিস বিদ্যমান এবং এই দুই দপ্তরের বড় সংখ্যক কর্মচারী বডি পোস্টার পরিধান কর্মসূচীতে অংশ নেয়। আশ্চর্যের বিষয় এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীর উপর শাসকদল সমর্থিত কর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বেপরোয়া আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। নব কোষাগার ভবনের অষ্টম তলে অবস্থিত জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মীদের উপর ১-৩০ মিনিট নাগাদ শাসকদল সমর্থিত কর্মী সংগঠনের কর্মচারীগণের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক (১০০ জনের অধিক) বহিরাগত, অনিয়মিত ও পুনর্নিয়োগ করা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে দপ্তরের মধ্যে প্রবেশ করে সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির সদস্যগণের শরীর থেকে বডি পোস্টার ছিঁড়ে নেয় ও শারীরিক হেনস্তা করে। মহিলাকর্মীগণ তার প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে এবং লোক দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির সদস্য বন্ধুদের, যারা প্রশাসনিক ভবনের সামনে চলা জমায়েতে উপস্থিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তাদের ঘেরাও করে রাখা হয়। পরিকল্পিতভাবেই এটা করা হয় যাতে মূল জমায়েতটি বিশাল আকার নিতে না পারে। এই আক্রমণে আক্রান্ত হন উৎপল শীল, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ কর্মকার সহ মহিলা সদস্যগণ। এই আক্রমণ যখন অফিস অভ্যন্তরে সংগঠিত হচ্ছে তখন ভূমি দপ্তরের আধিকারিক কোনোরকম ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই নিজের চেম্বারে বসেছিলেন।

নীচে সভা চলাকালীন এই খবর পৌঁছলে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব সভাটিকে জেলা শাসকের ঘরের সামনে স্থানান্তরিত করেন এবং ডেপুটেশন দেন। ঐ সভা শেষ হতেই সকলে এডিএমএলআর-এর ঘরের সামনে উপস্থিত হয়। ততক্ষণে বহিরাগতরা ঐ স্থান ত্যাগ করে। সকলে মিলে আধিকারিকের ঘরের সামনে ধিক্কার জানায় এবং এরপর এডিএমএলআর-এর ঘরে নেতৃত্ব সহ সকলে প্রবেশ করে ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশন থেকে বেরিয়ে নব কোষাগার ভবনের প্রতিটি তলে স্লোগান সহকারে মিছিল করা হয় ও পরবর্তীতে নিচের তলায় একটি সংক্ষিপ্ত সভা করে এই ঘটনার প্রতিবাদে কর্মসূচি গ্রহনের বার্তা দিয়ে সভা শেষ হয়।

১১ তারিখ টিফিনের সময় বিক্ষোভ সভায় ২০৫ জন উপস্থিত ছিলেন। □

দৃষ্টি আকর্ষণী

নতুন গ্রাহকবর্ষে চাহিদা দ্রুত জানানোর জন্য জেলা ও অঞ্চল কমিটিগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী।

—পত্রিকা সম্পাদক মণ্ডলী

রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী স্মরণে

চিরন্তন রবীন্দ্রনাথ

অরিন্দম ব্যানার্জী

ধর্মের নামে যারা নিকৃষ্ট বেসাতি করে— সারা দেশ জুড়ে তারা আজ আবার শক্তি সঞ্চয় করছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যারা গোটা দেশে ছড়িয়ে দিতে চায়, সেই দানবীয় শক্তির কালনাগিনীর ফণা আজ আবার বিষাক্ত ছোবল মারতে উদ্যত। রাম রহিমের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় রক্তের হোলি খেলে যারা পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হয়— তারা আবার নখদন্ত বার করছে। এই সময়েই আমাদের বড় বেশী করে প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথকে। জওহরলাল নেহরু তাঁর 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে যথার্থভাবেই বলেছিলেন— রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের ঠিক এইসময়ের চিন্তা!

ধর্মকে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে নেওয়ার প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই সমর্থন করেন নি। গান্ধীজি পরিচালিত খিলাফত আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি। এই আন্দোলনকে তিনি 'ধর্মতন্ত্র' রক্ষার চেষ্টা হিসেবে দেখেছিলেন। পরিবর্তে কামাল পাশাকে তুরস্কের প্রগতিশীলতার দূত হিসেবে তিনি দেখেছিলেন। 'অস্পৃশ্যতার পাপে ভূমিকম্প হয়েছে বিহারে'— গান্ধীজির এই অবৈজ্ঞানিক যুক্তিকে কড়া ভাষায় নিন্দা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৬ সালের মার্চে কলকাতায় এবং অন্যান্য অঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় রবীন্দ্রনাথ তাতে মর্মাহত হয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীকে ঐ বছরের এপ্রিলে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই মর্মবেদনা ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯২৬ সালেই তিনি 'ধর্মমোহ' নামে অবিস্মরণীয় কবিতাটি লেখেন—

''ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
.....
.....
পূজা গৃহে তোলে রক্তমাখান ধ্বজা—
দেবতার নামে এযে শয়তান ভজা।''

হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা সংঘটিত হয়, তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

''ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।''

তথাকথিত ধর্মধ্বজীদের পরিবর্তে তদানিন্তন সমাজে নিন্দিত 'নাস্তিক'-দের উপরেও আস্থা ব্যক্ত করে তিনি লিখেছিলেন—

''নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো—
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।''

রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পুরোহিততন্ত্র, মোল্লাতন্ত্র কিংবা যাজকতন্ত্রকে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বদা খড়্গহস্ত। সত্যদ্রষ্টা কবি একথাও স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে, যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদী শক্তিসমূহ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই 'ধর্মতন্ত্র' এবং সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে। ১৯৩৮ সালে কুখ্যাত মিউনিখচুক্তির ফলে চেকোস্লোভাকিয়ার সর্বনাশে ব্যথিত ক্রুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতা—

''ওই দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গীর্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
দীনাত্মাদের বিশ্বাস ওরা
ভীত প্রার্থনা রবে
শান্তি আনিবে ভবে।
কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়িদড়া।।''

রবীন্দ্রনাথ মনশ্চক্ষে কি দেখতে পেয়েছিলেন বর্তমান সময়কে? পেয়েছিলেন— সেই জন্যই তো তিনি যেন আমাদের ঠিক এই সময়ের চিন্তা! শোষণপন্থী পুঁজিবাদ নিজের স্বার্থে যে কী ঘৃণ্য কৌশলে ধর্মতন্ত্রকে কাজে লাগায় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'রক্তকরবী' নাটক। রবীন্দ্রনাথের দেবতা ছিল মানুষের মাঝখানে। 'ধর্ম' আর 'ধর্মতন্ত্র' যে এক নয় সে কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। মহামানবের কবি ১৯৩০ সালের মে মাসে অক্সফোর্ডে যে হিবার্ট বক্তৃতা দেন তার নাম ছিল 'Religion of Man'। এই বক্তৃতার পরই তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। এই সময় থেকে তাঁর চিঠিপত্র, ভাষণ, কবিতা প্রভৃতির মধ্যে 'নরদেবতা'র বন্দনা সজোরে উচ্চারিত হয়েছে। নিন্দিত হয়েছে আনুষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম। রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৩০ সালের ৫ অক্টোবর নন্দলাল বসুকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না যে অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতির জন্যও এদের সমান প্রচেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুথির মন্ত্রে? দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে? মানুষকে যারা কেবলি ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে?''

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন— নেই। ১৯৩১ সালের ১২ এপ্রিল

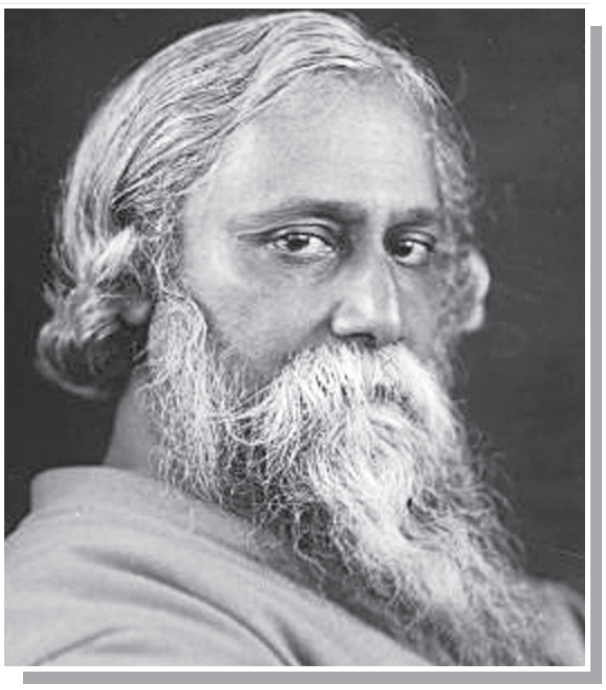

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ''আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। ... মাদুরার মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা আমাকে সগৌরবে দেখানো হল তখন লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞানতা অস্বাস্থ্য ঐ সব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।''— রবীন্দ্রনাথ— যেন আমাদের ঠিক এই সময়ের চিন্তা!

এখানেই শেষ নয়। হেমন্তবালা দেবীকে পুনরায় ২০ এপ্রিল ১৯৩১ সালে তিনি লিখেছেন—যেখানে ধর্মের নামে স্পষ্টতই অন্যায় অত্যাচার এবং অধর্ম চলছে সেখানে কোনো কারণেই আমি তাকে স্বীকার করে নিতে পারিনে। আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। তিনি মানুষের স্বর্গেই বাস করেন। মানুষের নরকও আছে— সেইখানে মূঢ়তা সেইখানে অত্যাচার, সেইখানে অসত্য।

সেই অন্ধতা মূঢ়তাকে, পাপকে তিনি দেখেছিলেন গয়া তীর্থধামে। ক্ষোভের সাথে এ প্রসঙ্গে ১৯৩১ সালের ১৪ জুন তিনি লিখেছেন— গয়াতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলুম তখন পশ্চিমের (পশ্চিম ভারতের) কোন এক পূজামুগ্ধা রাণী পাণ্ডার পা মোহরে ঢেকে দিয়েছিলেন— ক্ষুধিত মানুষের অন্নের থলি থেকে কেড়ে নেওয়া অন্নের মূল্যে এই মোহর তৈরি। এ দেশে হতভাগ্য মানুষের সমস্ত প্রাপ্য দেবতা নিচ্ছেন হরণ করে।

রবীন্দ্রনাথ— যেন আমাদের ঠিক এই সময়ের চিন্তা!

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দাপটে ক্ষুব্ধ অতিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ তাই ব্রাত্য, মন্ত্রহীন মানুষজনের সাথে একাত্মতা বোধ করে ২৩ জুন ১৯৩১ সালে লিখেছিলেন— দেশ বিদেশের সেই সব নাস্তিক ভক্তদের আমি আপন ধর্মভাই বলে জানি। সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাঁদের বেশি দেখলুম, কিন্তু তাঁরা যে দেশে থাকেন, সে দেশ বিদেশ নয় সে যে সর্বমানবলোক।

'সর্বমানবলোকে'র বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ তাই জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে রচনা করেছিলেন এক অপূর্ব সঙ্গীত—

''ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধুলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ'
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় হে মানব অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।।''

রবীন্দ্রনাথ—যেন আমাদের ঠিক এই সময়ের চিন্তা!

শুধু সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহের বিরুদ্ধেই নয়—পুঁজিবাদী শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠেছে এই মহামানবের কবির বজ্রবাণী। ১৯৩১ সাল। মেদিনীপুর জেলার হিজলি বন্দীশালায় আটক বিপ্লবী বন্দীদের উপর ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ নির্বিচারে লাঠি গুলি চালায়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বন্দীরাও এই নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাননি। বহু বন্দী নিহত হন। আহত হন প্রচুর। এই বিষম সংবাদে কবিহৃদয় গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি নেমে এলেন জনতার মাঝে। ময়দানে মনুমেন্টের জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি তীব্র ভাষায় এঘটনার প্রতিবাদ জানালেন। এমনকি গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের প্রতি সংশয় প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। এত বড় ঘটনার প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস দলের নিষ্ক্রিয়তাকেও তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ—যেন আমাদের ঠিক এই সময়ের চিন্তা!

ব্রিটিশ শাসনাধীন অসহায় অত্যাচারিত ভারতবাসীর মুখে তিনি দিলেন প্রতিবাদের ভাষা। মনে দিলেন দুর্জয় শক্তি—তাঁর বজ্রলেখনীর মধ্য দিয়ে—

''যত বড় হও
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
'আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে।''

কী দূর্জয় রবীন্দ্রনাথ! তিনি কি মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন বর্তমান কঠিন সময়কে? নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। শ্রমজীবী জনগণের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর জীবনে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতি অপরিসীম ঘৃণার প্রকাশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর লেখনীতে। ১৯৩৭ সালে গঙ্গার দুই তীরের চটকলগুলিতে ধর্মঘটের নিশান উড়িয়েছিল বাংলার শ্রমিকশ্রেণী। ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকদের সমর্থনে দেশের মানুষের জাগ্রত বিবেকের কাছে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন—I appeal to my countrymen to help the jute workers and their helpless women and children in the period of their suffering and distress. রবীন্দ্রনাথ যে জানতেন—শ্রমিকশ্রেণী না বাঁচলে দেশ বাঁচে না।

রবীন্দ্রনাথ—যেন আমাদের ঠিক এই সময়ের চিন্তা!

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে স্পেনের মানুষ তখন ক্ষতবিক্ষত। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কি চুপ করে থাকা সম্ভব! মহামানব-এর কবি গোটা দুনিয়ার প্রগতিশীল মানুষের কাছে আহ্বান জানালেন—At this hour of the supreme trial and suffering of the spanish people, I appeal to the conscience of humanity (স্পেনের জনগণের এই চূড়ান্ত দুঃখ দুর্দশার সময় আমি বিশ্বমানবের বিবেকের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি)। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এ লড়াই শুধু স্পেনের জনগণের লড়াই নয়। কিংবা এ লড়াই শুধু তুলি কলম ফেলে স্পেনের রণাঙ্গনে ছুটে যাওয়া প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের লড়াই নয়। এ লড়াই হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানবতার লড়াই। বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার লড়াই। এ লড়াই হল বিশ্বমানবের বেঁচে থাকার লড়াই। ঠিক যেমনটি ভেবেছিলেন রোজা লুক্সেমবার্গ— the choice is between socialism and barbarism (হয় সমাজতন্ত্র নয় বর্বরতা)।

কী চূড়ান্ত আশাবাদী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ! তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের নাৎসি বাহিনী হঠাৎ সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর। অতর্কিত আক্রমণে প্রথম দিকে নাৎসি বাহিনী এগিয়ে যেতে থাকে। ক্ষতবিক্ষত রবীন্দ্রনাথ। রোগ শয্যায় শুয়ে তিনি ছটফট করছেন। প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধের খবরাখবর নিচ্ছেন। মনেপ্রাণে কামনা করছেন সোভিয়েতের লাল ফৌজের বিজয়। না হলে যে তাঁর 'এ জন্মের তীর্থদর্শন' বিফল হয়ে যাবে! ৩০ জুলাই সকালে অস্ত্রোপচারের ঠিক আগে কবি যখন জানতে পারলেন যে, লালফৌজ রুখে দাঁড়িয়েছে এবং নাৎসি বাহিনীকে প্রতিরোধ করছে—আনন্দে তাঁর মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল! রোগশয্যার পাশে দন্ডায়মান প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশকে উদ্বেলিত চিত্তে তিনি বলে উঠলেন—'পারবে, পারবে, ওরাই পারবে। ভারী অহঙ্কার হয়েছে হিটলারের'।

কী আদিগন্ত আশাবাদ! সত্যদ্রষ্টা কবির ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে নির্ভুল প্রতিপন্ন হয়েছিল। মানবতার প্রতি কি প্রগাঢ় আস্থা! এই আদিগন্ত আশাবাদই আজ আমাদের পাথেয়।

রাশিয়া থেকে ফিরে কবি তখন আমেরিকায়। সেদেশে বসেই তিনি তখন কলকাতায় ও ঢাকায় বিপ্লববাদীদের উপর পুলিশি অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যের খবর পাচ্ছেন। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে সেই সংবাদ চিঠির মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে তিনি সুধীন্দ্রনাথকে লিখছেন—''সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি—দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটাই স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা পুলিশের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বলো, এখনও অনেক বাকি আছে—তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে যে, বড়ো লাগছে—সে কথা বললেই গুন্ডার লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।'

কী পরমাশ্চর্য রবীন্দ্রনাথ! তিনি কি সেই ১৯৩০-এ বসেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন ২০১৫-র বিশ্বকে। নিজেদের সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা মানুষেরা বোধ হয় এভাবেই ভাবেন। এই চিরন্তন রবীন্দ্রনাথই আজ আমাদের পাথেয়।

রবীন্দ্রনাথ—যেন আমাদের ঠিক এইসময়ের চিন্তা! □

আমাদের মে দিবস

মানস দাস

১লা মে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। পৃথিবীর দেশে দেশে পালিত হয় মে দিবস। শিল্প বিপ্লবের ফলে আধুনিক শিল্প উৎপাদনের শুরু থেকে নতুন শোষণ ব্যবস্থায় শোষিত শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ হয় শ্রমিক শেণীর। ব্যবস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটলো পুঁজিবাদের।অসংগঠিত শ্রমিকদের নতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে উৎপাদনের জন্য প্রথম থেকেই ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো। প্রবল ক্ষোভে এক সময় তারা মনে করতো মেশিনই তাদের শত্রু। শুরু হয়েছিল মেশিন ভাঙ্গার লুডাইট আন্দোলন। পরে হয়েছিল চার্টিষ্ট আন্দোলন। ১৮৪২ সালে নির্মম ভাবে দমন করা হয় সেই আন্দোলনকে। ১৮৪৭ সাল ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট প্রথম শিশু ও নারীদের জন্য ১০ ঘণ্টা কাজের আইন করে কিন্তু পুরুষ শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা অপরিবর্তিত রেখেই এই আইন পাশ হয়। যেখানে যেখানে পুঁজিবাদের আত্মপ্রকাশ হয় সেখানেই চলে এই নির্মম শোষণ। ১৮৩৪ সালে ইংল্যান্ডে যন্ত্রকল শ্রমিকদের মধ্যে কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে প্রথম ধর্মঘট হয়। কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে আন্দোলন হয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকায়। আমাদের দেশেও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাস বহু পুরনো। ১৮৬২ সালে মে মাসে হাওড়ায় কুলি কামিন ১২০০ রেল শ্রমিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেছিল। পৃথিবীর দেশে দেশে যেখানে পুঁজিবাদ বিকশিত হয়েছে সেখানেই কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। শোষণ ও বঞ্চনার সরণীতে তীব্র আক্রমণ, খুন, ফাঁসিকে বরণ করেই জন্ম নেয় ৮ ঘণ্টা কাজের সর্বজনীন দাবি।

১৮৮৬ সালে ১লা মে আমেরিকায় ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ধর্মঘট সর্বাত্মক রূপ নেয় নানান শহরে। ৩রা মে ম্যাককরমিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ গুলি চালিয়ে ২ জনকে খুন করে। বহু শ্রমিক আহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৪ মে হে মার্কেটে ডাকা হয় বৃহত্তর শ্রমিক সমাবেশ। অগণিত মানুষের সমাবেশে পরিকল্পনা মতো পুলিশের এক গুপ্তচর, প্ররোচনা তৈরী করতে পুলিশের দিকে বোমা ছোঁড়ে। পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে ঘটনাস্থলে ১ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়। ৪ জন শ্রমিক নেতা পারসনস্, স্পাইস, ফিশার ও এঞ্জেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রহসনের বিচার শেষে তাঁদের ফাঁসীতে ঝোলানো হয়।

১৮৮৯ সালের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৮৯০ সাল থেকে ১লা মে তারিখ প্রতিবছর

ফিলিপাইন্সে শ্রমজীবীদের মে দিবস প্রতিপালন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে পালিত হবে। সেই থেকে আজ অবধি পালিত হয়ে আসছে মে দিবস।

□

সকালবেলায় কাগজে ওপরের লেখাগুলিই চোখ বুলিয়ে ১লা মে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম সংগঠনের কর্মসূচীতে যাওয়ার জন্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় চেনা বন্ধুর বার্তা এলো নিউইয়র্ক থেকে, মে দিবস-এর জন্মস্থান থেকে। 'কি করছিস আজ?'। ওখানে 'মে ডে'র মর্ম বহুকাল আক্রান্ত। কানাডা ও আমেরিকাতে ১৮৯৪ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সোমবার লেবার ডে হিসাবে পালিত হয় এসেছে। মে দিবসের স্বীকৃতির জন্য বামপন্থীরা সংগ্রাম করেছে বারেবারে, ১৯৩০-এ গ্রেট ব্রিটেনের গ্রেট ডিপ্রেসনের সময় ব্যাপক মিছিল, ১৯৭২-এ ব্যাপক ধর্মঘট, ২০০৬-এ সাধারণ ধর্মঘট, অধুনা ২০১২তে অকুপাই ওয়াল স্ট্রীট আন্দোলন হয়েছিল মে দিবস কে সামনে রেখে সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিতে ওরা আর সুযোগ দিতে রাজি নয়। ১মে 'আমেরিক্যানাজেশন ডে' হিসাবে তুলে ধরা হয় 'ভলেন্টিয়র অফ ফরেন ওয়ার' গ্রুপ ও কমিউনিস্ট বিরোধী গ্রুপ গুলির থেকে। ১ মে ১৯৪৯এ নাম পরিবর্তিত হয় 'লয়ালটি ডে' হিসাবে। ১৯৫৮তে ১ মে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষিত হয়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের কাছে ১ মে শোষণের আইন মানার দিন! অন্যদিকে পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষ লাল পতাকাকে উর্ধ্বে ধরে আজও শোষণ মুক্তির শপথ নেয় ১লা মে। যতদিন অতিবাহিত হচ্ছে নতুন নতুন দেশে মে দিবস-এর স্বীকৃতি বাড়ছে। ভারতবর্ষে প্রথম মে দিবস উদ্‌যাপন হয় ১ মে ১৯২৩-এ মাদ্রাজে লেবার কিষাণ পার্টি অব হিন্দুস্থান এর উদ্যোগে। প্রথমবার লাল পতাকা উঠলো ভারতবর্ষে মে দিবসে। দু জায়গায় উদ্‌যাপিত হয়, একটি কর্মসূচী হয় মাদ্রাজ হাইকোর্টের উল্টোদিকে অন্যটি হয় ট্রিপলিক্যান বিচে। পতাকা উত্তোলন করেন সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার।

□

আজ এই নব্য উদারনীতির যুগে কেমন আছে পুঁজিবাদের জন্মলগ্নের শ্রমিক শ্রেণী? কেমন আছে নিপীড়িত সমাজের মানুষেরা? শিল্প বিপ্লবের সময়কালের শোষণের থেকে কয়েকশো গুণ শোষণ বৃদ্ধি পেয়েছে আজ। উন্নয়ন(!) হচ্ছে অথচ লোকের কাজের যোগান হচ্ছে না। অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তথ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবীর ১৮-২৫ বছর বয়সের কর্মক্ষম ছেলেমেয়ের অর্ধেকের হাতে কাজ নেই। বহু দিন ধরে বহু সংগ্রামের ফলে যেটুকু শ্রম আইনের রক্ষাকবচ অর্জিত করেছিল শ্রমজীবী মানুষ তা আবার কেড়ে নিচ্ছে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইন সংশোধন করে। তার বিরুদ্ধে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন যৌথভাবে ২ সেপ্টেম্বর দেশজোড়া ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ঠিকা শ্রমিক তৈরী করা হচ্ছে স্থায়ী শ্রমিকের বদলে। ফলে তার উপর চলছে লাগামহীন শোষণ। সারা পৃথিবীতে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে অসংগঠিত শ্রমিকেরা। স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরেও দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৯৪ শতাংশ শ্রমজীবীদের কোনো ন্যূনতম মজুরি আইন নেই। কোনো সামাজিক সুরক্ষা নেই। আমাদের রাজ্যে বর্তমানে ১ কোটি ৮০ লক্ষের বেশি অসংগঠিত শ্রমিক আছেন। খেতমজুর আছেন ১ কোটি। পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের প্রায় সমস্ত ধরনের অসংগঠিত শ্রমিক, বন্ধ কলকারখানার শ্রমিক, ও খেতমজুরদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা চালু করেছিলেন যা এখনো বর্তমান সরকার সবটা বন্ধ করতে পারে নি।

রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন শ্রমিকরা নিয়মিত বেতন, পেনশন না পেয়ে আত্মহত্যা করছে। বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা আত্মহত্যা করছে। অথচ বর্তমান সরকারের কোনো হেলদোল নেই।

রাজ্য সরকারের মদতে দালাল চক্র ও আমলাদের একাংশ ওয়েলফেয়ার বোর্ডগুলিকে গরিবদের টাকা লুঠ করার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। বোর্ডগুলি হাতে বরাদ্দের কোটি কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ শ্রমিকরা আজ তা পাচ্ছে না।

□

আট ঘণ্টা কাজ আট ঘণ্টা বিশ্রাম আট ঘণ্টা আমোদ প্রমোদের সর্বজনীন দাবিকে নিয়ে শতাব্দী প্রাচীন এই লড়াই আজ কোনখানে? সাউথ সেকশনে শম্পা, মালতি বা জবা সকালের প্রথম ট্রেনে লক্ষ্মীকান্তপুর বা ক্যানিং লোকাল ধরে কোলকাতা ঢোকে বাড়ী বাড়ী কাজ করতে। সকালের প্রথম 'ক্যাব' তুলে নিয়ে যার শ্রেয়সী, অপরাজিতা বা পৌলমীকে লবণহ্রদের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ১০-১২ ঘণ্টা কাটিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফেরে সবাই। শম্পা কিংবা শ্রেয়সী দুজনকেই সামলাতে হয় বাড়ী ফিরে তার তার মতন করে পরিবার। সবাই তার তার মতো করে শোষিত। নব্য উদারনীতির যুগে মেয়েরা সর্বাধিক শোষণ বঞ্চনার শিকার। সকাল বেলা আজিজুল, শ্রীকান্ত বা গোলাম রিক্সাটা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়, ১০-১২ ঘণ্টা পেরিয়ে বাড়ি ফেরে রাতে। ছেনি হাতুড়ি নিয়ে ইয়াসিন বা মকবুল মিস্ত্রী বা খেতমজুর গোবিন্দর জীবনের দিনলিপিটা একই। কোথায় আমোদ-প্রমোদ আর বিশ্রামের সময় আছে তাদের?

যতদিন যাচ্ছে উন্নত প্রযুক্তি মানুষের শ্রমের একটা বিকল্প হয়ে উঠছে। শ্রমের বিকল্প প্রযুক্তি যা মানুষের আশীর্বাদ হওয়ায় কথা এই ত্রুটিপূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাকে অভিশাপে পরিণত করছে। কাজ পাচ্ছে না মানুষ। আর যারা কাজে যুক্ত হচ্ছে তারা অসীম বঞ্চনার শিকার। বাস্তবিকভাবেই পুঁজিবাদের গোড়ায় একজন শ্রমিক ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা কাজ করে যে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরী করতো, মালিকের জন্য যে মুনাফা তৈরী করতো আজ উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে ২ ঘণ্টা শ্রম দিয়েই সেটা হয়তো সে করতে পারে। সে যখন আজ ১০ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে তখন সে আরো অনেক বেশী উদ্বৃত্ত তৈরী করছে। তার শ্রমের প্রকৃত মূল্য কিন্তু সে পাচ্ছে না। অফুরন্ত উৎপাদন ক্রয় করার মতো পয়সা মানুষের নেই। তাই পণ্যের পাহাড়ে জমে যায়। উৎপাদন বন্ধ করে দেয় মুনাফালোভী মালিক। এই পচাগলা ব্যবস্থায় তাই মানুষের কাজ হারানো, তাই কাজ না পাওয়া। আরো বেশী বেশী করে শোষিত হচ্ছে মানুষ। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীজুড়ে শ্রমজীবী মানুষ আজ গর্জে উঠছে। মে দিবস সেই গর্জে ওঠার শপথ নেওয়ার আন্তর্জাতিক দিন। □

দেশে দেশে মে দিবস

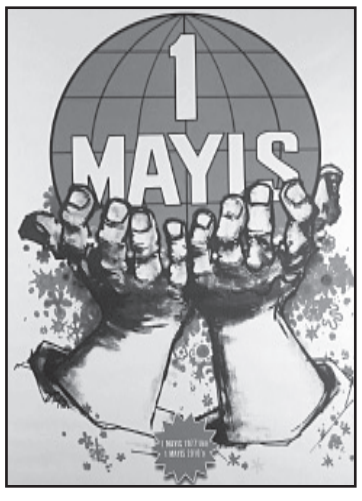

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ১ মে '১৫তে হাজারো শ্রমিক কর্মচারী মিছিল সরকার নিষিদ্ধ টাকসিম স্কোয়ারে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে জলকামান ব্যবহার করতে হয়।

প্যারিসে এই দিন ফ্রান্সের চরম দক্ষিণপন্থী ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মহিলারা অভিনব প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হন। তাঁদের শরীরে লেখা ছিল—চরম ফ্যাসিবাদী লে পেন। লে পেন হলেন ন্যাশনাল ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট।

মস্কোতে লাখো মানুষ লাল পতাকা ও ফুল নিয়ে মিছিল করে রেড স্কোয়ারে সমবেত হন।

কুয়ালালামপুরে লক্ষ লক্ষ মানুষ মিছিল করে পেট্রোনাস টাওয়ারে সমবেত হন।

বাংলাদেশের ঢাকায় বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা এবং অন্যান্য শ্রমিকরা 'বাঁচার মতো মজুরী চাই' এই স্লোগান তুলে মিছিল করেন।

টোকিওতে পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়ে পরমাণু নিরাপত্তার পোশাক পড়ে মিছিল করেন মানুষ।

ইন্দোনেশিয়াতে স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার পক্ষে এবং বেকারদের চাকরীর দাবিতে লাল টুপিতে সজ্জিত শ্রমিক কর্মচারীরা মিছিল করেন।

এছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ১ মে ২০১৫-তে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ নয়া উদারঅর্থনীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন। □

শহীদ মিনারে মে দিবস

বামপন্থী কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন ও ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে গত ১ মে শহীদ মিনারে এক মহতী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ সিআইটিইউ নেতা শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, শ্রমিক ঐক্য ভাঙার চেষ্টা হলে শ্রমিক শ্রেণীই সংগ্রামের মাধ্যমে তা প্রতিহত করবে। শ্রমিক শ্রেণী কখনো ধর্মঘটের অধিকার ত্যাগ করতে পারে না।

পুঁজিবাদ ও স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী তার সংগ্রাম জারী রাখবে।

শ্যামল চক্রবর্তী ছাড়াও বক্তব্য রাখেন দীপক দাশগুপ্ত, ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত ও বিভিন্ন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃবৃন্দ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের প্রবীন নেতা মহম্মদ আমিন। সভাপতিত্ব করেন ইউটিইউসি নেতা অশোক ঘোষ। □

শুভেন্দু মাণিক্য সেনগুপ্ত

সমিতি/অঞ্চলে মে দিবস প্রতিপালিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে সমিতির কেন্দ্রীয় ভবন (কারুকৃৎ ভবন)-এ যথাযথ মর্যাদায় মে দিবস প্রতিপালন করা হয়। বেলা ২টায় মে দিবসের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি তাপস সেন। মে দিবসের প্রাসঙ্গিকতা যা আজকের দিনেও আরও বাড়তি গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র পাল।

৬০ জনেরও বেশি সদ্যস্যবন্ধু এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। সমিতি ভবনের কর্মসূচীর পর সদস্যবন্ধুরা কর্মচারী ভবনের সমাবেশে যোগদান করেন এবং সেখান থেকে মূল মিছিলে অংশগ্রহণ করে শহীদ মিনার ময়দানের কেন্দ্রীয় সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। □

১ মে **পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির** কেন্দ্রীয় দপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

সমিতির সভানেত্রী পৌষালী সরকার রক্ত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মে দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচীর সূচনা করেন। অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক উৎসর্গ মিত্র মে দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ব্যাখ্যা রাখেন। অপর যুগ্ম-সম্পাদক তাপস চক্রবর্তী বর্তমান প্রেক্ষাপটে মে দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। উক্ত কর্মসূচীতে শতাধিক কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছিলেন। □

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (WBMOA) এবং **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ভূমি সংস্কার কর্মচারী সমিতি** যৌথভাবে মে দিবস অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে প্রতিপালন করেছে সমিতি দুটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৫০ সূর্য সেন স্ট্রীটের 'রাজেন্দ্র ভবনে'।

অনুষ্ঠান শুরুতে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির (WBMOA) সহ-সভাপতি রত্না সেনগুপ্ত। উপস্থিত সমিতি দুটির সাধারণ সম্পাদকদ্বয় সহ অন্যান্য বর্তমান ও প্রবীণ নেতৃত্ব শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন।

এরপর রাজেন্দ্র ভবনের মানস ঘোষ সভাকক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শংকর ঘোষ, রত্না সেনগুপ্ত ও গুরুপ্রসাদ মণ্ডলকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবলা মুখার্জী ও পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ভূমি সংস্কার কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বাগচী। এছাড়াও সভাতে বক্তব্য রাখেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব অশোক সেনগুপ্ত। বক্তারা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আজকের দিনে মে দিবসের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুঁজির শোষণ যত তীব্র হচ্ছে, শ্রমের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পূর্বাঞ্চলের উদ্যোগে ১ মে, ২০১৫ 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস' পালিত হয়েছে। ঐ দিন দুপুর ২টায় অঞ্চল দপ্তরে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মসূচীতে ৩৫ জন কর্মী-নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন অঞ্চলের সভাপতি প্রশান্ত সমাদ্দার, তারপর অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। পরবর্তীতে মে দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অঞ্চলের সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত। অনুষ্ঠান শেষে কর্মীরা কর্মচারীভবনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন ও মিছিল সহকারে শহীদ মিনার ময়দানের সমাবেশে যোগ দেন। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের উদ্যোগে গত ১ মে সকাল ৮-৩০ টায় পুলকার দপ্তরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসের কর্মসূচী অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সুব্রত কুমার গুহ, যুগ্ম-সম্পাদক সুব্রত মজুমদার, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রিয়ব্রত ভৌমিক, সেক্টর কনভেনর প্রবীর দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সংক্ষিপ্ত কর্মসূচীতে মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন সেক্টর কনভেনর প্রবীর দাস এবং অঞ্চল সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ।

সকাল ৯-৩০ টায় কলকাতা পুলিশ হাসপাতালের গেটে মহান মে দিবসের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ। শহীদবেদীতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সহ স্থানীয় নাগরিক কমিটির সদস্যরাও মাল্যদান করেন। এখানেও সংক্ষিপ্ত সভায় মে দিবসের কর্মসূচী উদ্‌যাপনের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অঞ্চল সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ। □

পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর কেন্দ্রীয় ভবন দীনেন্দ্র ভবন'-এ অন্যান্য বছরের মতো এবছরও যথাযথ মর্যদায় মে দিবসের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি সমিতির প্রবীণ নেতৃত্ব সঞ্জয় বসু। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সঞ্জয় বসু, সাধারণ সম্পাদক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকত্রয় সমীর ব্যানার্জী, প্রণব চক্রবর্তী ও নির্মলেন্দু ঘোষ, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয় সুব্রত কুমার গুহ ও পবন দাস, কোষাধ্যক্ষ বলদেব মুখার্জী, দপ্তর সম্পাদক শ্যামল দাশগুপ্ত, সংগঠন সম্পাদক অপূর্ব চ্যাটার্জী, স্মারক সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ নন্দী সহ উপস্থিত বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ। সভাকক্ষে অমর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত সভার কাজ শুরু হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের মূল আলোচক ছিলেন সংগঠনের মুখপত্র 'স্মারক'-এর সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ নন্দী। তিনি তাঁর আলোচনায় মে দিবসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহ বর্তমান সময়ের সাথে সাযুজ্য রেখে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল নন্-মেডিক্যাল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ১ মে ২০১৫ শিয়ালদহ স্থিত কেন্দ্রীয় দপ্তরে মে দিবসের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। বেলা ২টার সময় সংক্ষিপ্ত সভার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পল্লব দাস। সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্যের প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর বর্তমান প্রেক্ষিতে মে দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া। সভায় কলকাতার তিনটি অঞ্চল থেকে মোট ৩৫ জন সদস্য-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সমিতি দপ্তরে কর্মসূচী সমাপ্ত হলে সকলে কর্মচারী ভবনের মূল কর্মসূচীতে যোগ দেন। □

জাতীয় কার্যনির্বাহী সভা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রাখেন এবং সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এরপর নাসিকে জেলা পরিষদ ভবনে সন্ধ্যা ৬টার সময় কর্মীসভা হয়। সভায় সব জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্যদের পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। সভায় সুকোমল সেন, এ শ্রীকুমার, সুনীল যোশীসহ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভায় মোট ১৫টি রাজ্য থেকে ২জন মহিলা সদস্য সহ ৪৯ জন কার্যনির্বাহী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

দুদিনের সভা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়

(১) নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে দুর্গত মানুষদের পাশে দাড়াতে তহবিল সংগ্রহ হবে।

(২) ২৬ মে দিল্লীতে ১১টি সর্বভারতীয় সংগঠনগুলির আহ্বানে মবলংকার হলে জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণ সম্পাদক, সহ সাধারণ সম্পাদক সহ ৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

(৩) সংগঠনের পদাধিকারীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার দায়িত্বে থাকবেন মনোজকান্তি গুহ।

(৪) আগামী ২৯ জুলাই, ২০১৫ সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস— ৫ দফা দাবি নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে। দাবিসমূহ ঃ (১) অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, (২) নয়া পেনশন স্কীম বাতিল করতে হবে, (৩) শূন্য পদ পূরণ করতে হবে, (৪) ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করতে হবে, (৫) শ্রম আইন সংশোধন করা চলবে না।

(৫) আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৫ মাস ব্যাপী ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। কেরালা, হরিয়ানা, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবাংলায় অনুষ্ঠিত হবে।

(৬) মণিপুরের রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ওপর দমন পীড়নমূলক স্বৈরাচারী পদক্ষেপের প্রতিবাদে সব রাজ্যের সংগঠনের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রতিবাদ জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এছাড়াও এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি ও বকেয়া মিটিয়ে জমা দেওয়ার আহ্বান রাখা হয়। পরবর্তী সভা আগামী ২৩-২৪ আগস্ট, ২০১৫ বিহারের বেগুসরাই শহরে অনুষ্ঠিত হবে। □

বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা

অভিনব কর্মসূচী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মহকুমাগুলিতে ৮মের বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কালেক্টরেট দপ্তরের এই সভায় ৭৬ জন কর্মচারীর উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক উজ্জ্বল মুখার্জী।

নদীয়া ঃ জেলার ১৪টি ব্লক গড়ে (৭-৮) জন ৩টি মহকুমা গড়ে (১০-১৫) জন ও সদরের ২টি অঞ্চলে গড়ে (৬০-৭০) জন অ্যাপ্রন কর্মসূচী প্রতিপালন করেন। ৮ মে-র বিক্ষোভ সভা ১০টি ব্লক এবং ৩টি মহকুমাসহ সদর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কালেক্টরেট দপ্তরে (১৮০-১৯০) জন কর্মচারীর উপস্থিতিতে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক শঙ্কর ব্যানার্জী।

উত্তর ২৪ পরগনা ঃ জেলার বসিরহাট মহকুমার কয়েকটি ব্লক বাদে জেলার অবশিষ্ট ব্লকসহ তিনটি মহকুমা ও সদর ব্লকগুলিতে মোট ১৪৩৬ জন কর্মচারী অ্যাপ্রন পরিধান করে। সদর ব্লকগুলিতে ৮ মে-র বিক্ষোভ কর্মসূচীতে জেলা কালেক্টরেট দপ্তরে (২৪০-২৫০) জন কর্মচারীর উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন জেলা ১২ জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক খগেন নাগ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ জেলার ২৫টির মধ্যে ২৪টি ব্লক ও ৪টে মহকুমার সদর দপ্তরগুলিতে কোথাও (৩-৪) জন আবার কোথাও (৪০-৫০) জন অ্যাপ্রন পরিধান করে। ৮ মে-র বিক্ষোভ সমাবেশ আলিপুর সদর সহ ২টি মহকুমায় অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কালেক্টরেট দপ্তরে (৬০-৭০) জন কর্মচারীর উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন জেলার সভাপতি বাসুদেব সাহা।

লবণহ্রদ ঃ সারা রাজ্যের প্রতিটি জেলা এবং কলকাতার অঞ্চলগুলির সঙ্গে লবণহ্রদ অঞ্চলেও গত ৫ মে থেকে ৭ মে পর্যন্ত তিন দিন ধরে বডি পোস্টার পরিধানের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে। আন্দোলনের চতুর্থ দিনে অর্থাৎ ৮ মে অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক কর্মচারীদের বিক্ষোভ জমায়েত সংগঠিত হয়েছে। ৪টি দাবি নিয়ে বডি পোস্টারগুলি তৈরী করা হয়েছিল।

এই কর্মসূচীকে ঘিরে কর্মচারীদের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। শুধু কর্মচারীরাই নন, দপ্তরের কাজে আসা সাধারণ জনগণের মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। অনেক কর্মচারীকে চাহিদা সত্ত্বেও বডি পোস্টার সরবরাহ করা যায়নি, প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ কম থাকায়।

অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ জমায়েতগুলিতে বক্তারা এই কর্মসূচীর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তারা বলেছেন বিভিন্ন মুখীন কর্মসূচী রূপায়ণ সত্ত্বেও এই সরকার কর্মচারীদের দাবি দাওয়া মেটানোর সদিচ্ছা দেখাচ্ছে না। অজুহাত হিসাবে অর্থের অপ্রতুলতার কথা বলছেন। কিন্তু সরকার অজস্র অপব্যয়ের নিদর্শন প্রতিদিন দেখাচ্ছে অথচ কর্মচারীদের ন্যায্য বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান সম্পর্কে উৎসাহ দেখাচ্ছে না। অথচ এরা সরকারে আসার পূর্বে কর্মচারীদের নিয়ে অনেক কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছে, সরকারে এসে কর্মচারীদের উপর খড়্গহস্ত হয়েছে। কর্মচারীদের সন্ত্রস্ত করার জন্য ও তাদের ঐক্য, সংগঠনকে ভাঙার জন্য বদলিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। নির্বিচারে যেখানে খুশি কর্মচারীদের বদলি করে দিচ্ছে। হাজার হাজার শূন্য পদ পড়ে থাকলেও সেগুলি পূরণ করার কোনো উদ্যোগ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম বেতন কমিশন গঠন হয়ে গেলেও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশন গঠনের কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

মধ্যাঞ্চল ঃ গত ৫ মে থেকে ৭ মে মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন দপ্তরে বডি পোস্টার পরিধানের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। এই অভিনব কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের জন্য কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছিল। এরপর ৮ মে '১৫ খাদ্য ভবনে বডি পোস্টার পরিধান করে বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়, বিক্ষোভ কর্মসূচীতে আনুমানিক ৪৫০ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। বিক্ষোভ কর্মসূচীর আগে খাদ্যভবন প্রাঙ্গণে মিছিল সংগঠিত করা হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য্য এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য দেবব্রত রায় বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন মধ্যাঞ্চলের সভাপতি রত্না সেনগুপ্ত।

এছাড়া মধ্যাঞ্চলের অভ্যন্তরে ফায়ার সার্ভিস দপ্তরে এবং ক্যামাক স্ট্রীটে পি.এইচ.ই. দপ্তরে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলিতে যথাক্রমে ৩০ জন এবং ৩৫ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণাঞ্চল ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪ দফা দাবিতে সমগ্র রাজ্যের ৩৪১টা ব্লকের কর্মচারীদের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অভিনব পদ্ধতিতে নীরব প্রতিবাদের অংশীদার হয় কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের কর্মচারীরাও। গত ৫ থেকে ৮ মে টিফিন বিরতি পর্যন্ত ৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা, অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, শূন্যপদ পূরণ ও চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবি সংবলিত পোস্টার বুকে ধারণ করে কর্মচারীরা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। ৮ মে টিফিনের সময় ভবানীভবন, সার্ভে বিল্ডিং, বি জি প্রেস, লোকসেবা আয়োগ (পি এস সি) সহ অঞ্চলের ১৫টি দপ্তরে বিক্ষোভ সমাবেশে কর্মচারীরা শামিল হন। প্রায় সাড়ে তিন দিনের নীরব প্রতিবাদ ভাষায় রূপান্তরিত হয়। চাহিদার তুলনায় বডি পোস্টারের সংখ্যা কম হলেও মতাদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত অংশের কর্মচারীর মনন স্পর্শ করেছে এই অভিনব কর্মসূচী। এই কর্মসূচী উদ্বুদ্ধ করেছে আগামী দিনের অপেক্ষমাণ বৃহত্তর লড়াই সংগ্রামের জন্য কর্মচারীদের মানসিক প্রস্তুতির ইঙ্গিত বহন করছে।

কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে কর্মচারীবৃন্দ

নব-মহাকরণ ঃ বডি পোস্টারের কর্মসূচী অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে কর্মচারীদের মধ্যে। দাবিগুলি এবং দাবি জানানোর এই অভিনব আঙ্গিক এমনকি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য নন এমন কর্মচারীদেরও আকৃষ্ট করেছে। ৩ দিনে প্রায় ৩ শতাধিক কর্মচারী এই পোস্টারগুলি পরে দপ্তরে হাজিরা দিয়েছেন এবং সারাদিন কাজ করেছেন। ৮ মে নব-মহাকরণ ক্যান্টিন হলের সামনে টিফিন বিরতিতে প্রায় দুই শতাধিক কর্মচারীর জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এই জমায়েতে অঞ্চল সম্পাদক শুকদেব শীট বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন উল্লাস নাথ। □

বডি পোস্টার পরিহিত পুরুলিয়া জেলার কর্মচারীবৃন্দ

সন্ত্রাস শেষ কথা বলে না

প্রিয়ব্রত ভৌমিক

"মৃত্যু থেকে বড় নয় মৃত্যু পরোয়ানা।
আজ হয়তো বেঁচে আছি, কাল হয়তো লাশ...
আমি তবু লিখে যাব আমার বিশ্বাস।"

রক্তমাখা প্রতিবাদ পড়ে আছে ঘাতকের থাবার তলায়

মিথ্যার বেসাতি... ক্যানভাস...পরপর তিনটি তুলির আঁচড়... ফুটে ওঠা, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর গৈরিক (পড়ুন সন্ত্রাসের) অবয়ব... কেনাবেচার নির্ধারিত দাম লক্ষ লক্ষ টাকা... কর্পোরেট পুঁজির ধামাকা... না এটাই একমাত্র সত্য নয়। এর বিপরীতে অন্যতর জীবন, মৃত্যুকে অবহেলায় ঠেলে জীবনের জয়গান—ব্লগের পাতায় জীবনের আঁচড়, ঘৃণা আর ভালোবাসার আঁচড়, রাজীব হায়দার থেকে ওয়াশিকুর রহমান হয়ে অভিজিৎ রায় থেকে চলমান হত্যার মিছিলে অনন্ত বিজয় দাস... কাগজের আঁচড়ে ওপার এপার মিলে হুমায়ুন আজাদ, নরেন্দ্র দাভলকর থেকে গোবিন্দ পানসারে—সন্ত্রাসীরা দখল নিয়েছিল রাস্তা। রক্ত বেরোল ফিনকি দিয়ে, ছিটকে পড়ল শরীর প্রকাশ্য রাস্তায়। যুক্তিবাদী মানুষেরা, প্রতিবাদী মানুষেরা রাস্তার দখল নিলে এর পরিণতি হবে এমনই, সন্ত্রাসী আর শাসকেরা যেন এই বার্তাই পাঠাল। জমে উঠছে লাশ। লাশের গন্ধে বাতাস ভারী। লাশের পাহাড়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অনন্তের বিজয় ঘোষণা—লড়াই জারি আছে। থাকবে রক্তে ভেজা পতাকা— কাঁধ বদল হবে মাত্র।

সন্ত্রাস মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। ভয় দেখিয়ে সমষ্টির ভিতর থেকে মানুষকে একা করে দেয়। একা মানুষকে ভাঙার মধ্য দিয়ে সমষ্টিকে আরও বেশি করে ভাঙে। তৈরি করে এক বিপর্যয়ের ধারাবাহিকতা। সমষ্টি যত ভাঙে, সন্ত্রাস তত প্রবল হয়। মানুষের বেঁচে থাকার মৃত্যুপর্ব সূচিত হয়। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটাই চায়, তার নিজস্ব যন্ত্র দিয়ে তাকে কায়েম করতে চায়। এটাই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নমুনা।

মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ব্লগে অনন্ত বিজয় লিখলেন—অভিজিৎ রায়কে যখন খুন করা হয়, অদূরেই পুলিশ দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। খুনিরা নিশ্চিন্তে খুন করে চলে গেল।...

ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে যখন খুন করে খুনিরা পালিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ তখনও কিন্তু দাঁড়িয়ে ছিল। রাষ্ট্রের জামা কাপড় ছিঁড়ে আসল চেহারায় জীবনের ক্যানভাসে রক্তের আঁচড়ের দাগ এই শহীদদের আহ্বান। এইসব সাথীরা তরবারির চেয়ে কলমকে অনেক বেশি শক্তিশালী অস্ত্র মনে করে। এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, সমস্ত সামাজিক কলুষতার বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধির আকাশে আপনারা ডানা মেলতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে। শাবাশ আপনাদের। আপনারা অন্তত দেখিয়েছেন এই উপমহাদেশে মানুষও বাস করে। সবাই হাঁটু মুড়ে প্রসাদজীবী নয়। নিজেদের মগজ বেচে হামাগুড়ি দেওয়া নয়। খোলা রাস্তায় খুন হয়ে যাওয়া দামাল মানুষ মৃত্যুকে অস্বীকার করে কতটা রক্ত ঢাললে তবে অনন্তবিজয় পতাকা হাতে হেঁটে যায়। প্রচলিত জীবন যাত্রার মধ্যে এক অন্যতর নতুন জীবনের আখ্যান।

বিজ্ঞান চেতনাই আধুনিক যুগের ভিত্তি। এই ভুবনে নিরন্তর ঘটতে থাকা সমস্ত কিছুর কার্যকারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়াই বিজ্ঞান। বুঝতে শেখা, কি এবং কেন প্রশ্ন করতে শেখা। অন্ধবিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তির প্রাধান্য, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ মানবিকতার বাহন, তাই বাংলাদেশের ব্লগাররা এবং নরেন্দ্র দাভালকার, গোবিন্দ পানসারেরা এই কারণেই জারি রেখেছিলেন তাঁদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সংগ্রামীরা শহিদ হয়েছেন, কিন্তু লড়াই থেমে যায় নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ১৩ জন যুক্তিবাদী মানবতাবাদীর রক্ত ঝরলেও, থেমে যায়নি তাদের দেখানো পথে চলা। আগামীদিনে এমন আরও অনেকেই মৌলবাদের জঠরে পালিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

গণ গগনের পথে অগ্নিরথ
জনমানবের যাহারা টানিয়া আনে
তাহাদের সহকর্মী আমি...

২০১৩ সালের ২০ আগস্ট। প্রবীন মারাঠি চিকিৎসক নরেন্দ্র দাভোলকর। রাস্তায় আততায়ীর গুলিতে তাঁর শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। নরেন্দ্র দাভোলকর শুধু মানুষের শরীরের চিকিৎসা করতেন না। এই ভারতীয় সমাজের কুসংস্কারে জর্জরিত রুগ্‌ণ-অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থার চিকিৎসাও করতেন। তাঁর লড়াই ছিল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, বিজ্ঞান চেতনার পক্ষে।

২০১৫ সালের ২৬ আগস্ট। মুখের ভাষা, বাংলা ভাষা— ঐতিহাসিক দিন ২১ ফেব্রুয়ারির রেশ তখনও সারা বাংলাদেশ জুড়ে। কুপিয়ে খুন করা হল অভিজিৎ রায়কে। ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যা। কারণ 'মুক্তমনা' ব্লগে ক্রমাগত লড়াই জারী রেখেছিলেন কুসংস্কার আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে।

একই ফেব্রুয়ারিতে খুন হয়ে গেলেন আরও একজন, গোবিন্দ পানসারে এই মহারাষ্ট্রেই— গোবিন্দ পানসারে মার্কসবাদে বিশ্বাসী। বামপন্থী নেতা। অনবরত কলম ধরেছেন নানা সামাজিক অভিশাপের বিরুদ্ধে, মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে। ছত্রপতি শিবাজীকে নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ নতুন মূল্যায়ন, সত্যকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসেন, মৌলবাদী ক্ষিপ্ততার কারণে তাই এই হত্যাকাণ্ড।

এই বছরের ৩০ মার্চ ঢাকার তেজগায়ে শিল্পাঞ্চলে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হল ২৭ বছরের যুবক ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যুক্তিবাদ আর বিজ্ঞান মনস্কতার পক্ষে সক্রিয় তাঁর ব্লগ এবং কলমও। লিখেছিলেন আমিই অভিজিৎ। অভিজিতের মতোই ওয়াশিকুর লাশে পরিণত হলেন।

১২ মে ২০১৫, মাত্র একদিন আগে ফেসবুকে ব্লগার অভিজিৎ রায় এবং ওয়াশিকুর রহমানের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন তিনি। তাই তার মাশুল দিতে হল 'মুক্তমনা' ব্লগের আর এক লেখক অনন্ত বিজয় দাসকে। যাদের নৃশংস খুনের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন তিনি, ঠিক তাঁদের মতোই প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে খুন করা হল অনন্ত বিজয় দাসকে। এর আগেও একইভাবে খুন হয়েছেন লেখক হুমায়ুন আজাদ এবং শাহবাগ আন্দোলনের সংগঠক দৃঢ়চেতা রাজীব হায়দার।

আমরা ভুলে যাই নি দিল্লীর অদূরে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি প্রতিবাদী পথ নাটক শিল্পী, নাট্যকার, বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা সফদর হাসমিকে। শাসক দলের ভাড়াটে গুণ্ডারা প্রকাশ্য রাস্তায় দিনের আলোয় তাকে কারখানার গেটের সামনে পথনাটক করার জন্য পিটিয়ে হত্যা করে।

এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এই সমাজ প্রতি মুহূর্তে লালন করছে, পালন করছে এই ঘাতক বাহিনীকে, প্রয়োজনমতো প্রকাশ্যে খুনী বাহিনী হিসাবে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। কখনো বা গোপন আততায়ী হিসাবে এই বাহিনী শ্বাপদের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

পাশাপাশি এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটা আদর্শকে, তারই প্রতিবাদের ভাষাকে স্তব্ধ করার জন্য এই খুন। এবং এটাও পরিষ্কার যে এদের মুখের ভাষা আজ অনেকের মুখের ভাষা হয়ে উঠছে। খুন করেও এই ভাষাকে স্তব্ধ করা যাচ্ছে না। পতাকার কাঁধ বদল হচ্ছে মাত্র।

"রাতে যাকে হত্যা করো, সকালে সে বেঁচে/ডুবলে উঠতেই হয় সূর্য শিখিয়েছে..."

একদল ইতিহাস লেখেন, একদল ইতিহাস সৃষ্টি করেন। নতুন যুক্তি গড়া মানে পুরানো যুক্তি ভাঙা। এই শতাব্দীর পৃথিবীটা আর পুরানো পৃথিবী নয়। সঙ্কট... সঙ্কট... আর সঙ্কট। পুরানোটা ভেঙে যাচ্ছে... নতুনের জন্ম ছটফটানি। মানব সভ্যতার বিকাশের পথে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান, সেগুলিকে আত্মস্থ করেই নতুনের পথ চলা। বর্জনীয়কে বর্জন করতে হবে নির্মমভাবে, গ্রহণীয়কে গতির মধ্যে বিকশিত করার মধ্যেই আসবে আরও বিকাশ... রূপান্তর...। মানুষের প্রতি আস্থা, ভবিষ্যতের উপর আস্থা, নতুনের প্রতি বিশ্বাস, প্রচলিত ভুল ঝোঁক, ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে ১৯১৭ নভেম্বরের কামান গর্জনের প্রস্তুতি—"পুরানো সমাজের গর্ভে যে নতুন আসছে তাকে ভূমিষ্ঠ করার ধাত্রীর কাজ বল প্রয়োগ।" তাই এই সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার হিম্মৎ শহীদদের চেতনার ইনাম। এই চেতনাই একদিন সৃষ্টি করবে ইতিহাস আবার এই চেতনার কণ্ঠস্বরে কথা বলে উঠবে "শহীদ স্মরণে আপন মরণে রক্ত ঋণ শোধ করো"।

[ঋণ স্বীকার—সৃষ্টির একুশ শতক, একসাথে, অনীক, সময়ের ঘড়ি।] □

ডেয়ারীর কর্মচারীদের বিক্ষোভ

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

ডেয়ারীর কর্মচারীদের বক্তব্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীনে পাঁচটি ডেয়ারীর হাতে রয়েছে শত শত একর জমি। সরকারের লক্ষ্য এই সমস্ত জমিকে হস্তগত করে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় সাহায্য করা। ইতিমধ্যেই এই জমিগুলির মূল্য নির্ধারণ করার জন্য রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের চিফ ভ্যালুয়ারকে দায়িত্ব দিয়েছে। ইতিপূর্বে সরকারী পরিবহন নিগমগুলির জমির ক্ষেত্রে সরকার যা করেছে ডেয়ারীর ক্ষেত্রেও তা করতে চাইছে। তাই কর্মচারীদের অন্য দপ্তরে বদলি করে, পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে দপ্তরই তুলে দিতে চাইছে।

সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য বোঝা যায়, যখন দেখা যায় কর্মচারী সংগঠনগুলিকে আলোচনার জন্য এদিন সময় দেওয়া থাকলেও দুগ্ধ কমিশনার কর্মচারী সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা না করে পালিয়ে যান। অবশেষে দুগ্ধ কমিশনারের ব্যক্তিগত সচিবের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য আলোচনা করা গেছে।

পরবর্তীতে ২৮ মে ২০১৫ তারিখ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ৭টি সমিতির যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল ডেয়ারির কাঁচের গেটে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় এই বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট সমিতি সমূহের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অভিজিৎ রায় চৌধুরী এবং বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ। সাধারণ সম্পাদক তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে লড়াই জারী রাখার আহ্বান জানান। প্রায় ১৫ দিন ধারাবাহিক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি এবং সারা রাজ্যব্যাপী সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে এই আন্দোলনের ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। এই কর্মসূচীতে অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন নেতৃত্ব এবং ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। উপস্থিত কর্মচারীদের আরও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান রেখে ও সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভা শেষ হয়। □

নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের দাবি দিবস

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। ১২ মে বেলা ২ টায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে প্রায় তিনশো নার্সিং কর্মচারীদের একটি সুসজ্জিত মিছিল পথ পরিক্রমা করে মূল সভাস্থল রানী রাসমনি রোডে উপস্থিত হয়। বলাই বাহুল্য এই স্লোগান মুখর মিছিল কলকাতার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সভা পরিচালনা করেন শিপ্রা ভট্টাচার্য, সরস্বতী ভট্টাচার্য ও মায়া মুখার্জীকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী। প্রথমেই সমিতির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা গণসংগীত পরিবেশন করে। তারপর সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত ২১ দফা দাবিপ্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা গীতা দে প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। প্রায় ৬০০ কর্মচারী এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই দাবিপ্রস্তাব সভা থেকে গৃহীত হয়। সবশেষে সভানেত্রী শিপ্রা ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বিকেল ৫টায় সভার কাজ শেষ করেন। গৃহীত দাবিপ্রস্তাব সমস্ত প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিকট প্রেরণ করা হবে এবং সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা হবে। □

রক্তদান কর্মসূচী

লবণহ্রদ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি লবণ হ্রদ অঞ্চলের উদ্যোগে সেচভবন লনে কর্মচারী সমাবেশের মধ্য দিয়ে গত ২৬ মে, ২০১৫, বেলা ১২টায় "রক্তদান কর্মসূচী" অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বাণীপ্রসাদ ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন অঞ্চলের সভাপতি শ্যামল সরকার।

রক্তদান করেছেন ৩ জন মহিলাসহ ৩৩ জন সদস্যবন্ধু। এর মধ্যে ১ জন চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত মহিলা কর্মচারী রক্তদান করেছেন। □

বর্ধমান

গত ১ মে, ২০১৫ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা সদরে রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদরের বাইরে চারটি মহকুমায় মহকুমা কমিটিগুলির উদ্যোগেও রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র জেলার রক্তদান কর্মসূচীর তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

০১/০৫/২০১৫-জেলা সদরে ১০২ জন রক্তদান করেছেন ১৬ জন মহিলা সহ। ০৬/০৫/২০১৫- কালনা মহকুমায় ২৫ জন রক্তদান করেছেন। ০৭/০৫/২০১৫- আসানসোল মহকুমায় ৩০ জন রক্তদান করেছেন ৪ জন মহিলা সহ। ০৭/০৫/২০১৫- দুর্গাপুর মহকুমায় ১৪ জন রক্তদান করেছেন ১ জন মহিলা সহ। ০৮/০৫/২০১৫- কাটোয়া মহকুমায় ১৭ জন রক্তদান করেছেন ২ জন মহিলা সহ।

অর্থাৎ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সমস্ত জেলা জুড়ে ২২জন মহিলা সহ সর্বমোট ১৮৮ জন রক্তদান করেছেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কর্মচারী ও পেনশনারদের পরিবার থেকে বেশ কয়েকজন রক্তদান করেছেন। জেলা সদরে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিন শতাধিক কর্মচারী, পেনশনার ও পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। □

মালদহ

১৬ মে '১৫ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মালদা জেলা শাখার উদ্যোগে সদর রেজিস্ট্রেশন দপ্তরের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবির উপলক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শিবিরের উদ্বোধন ঘোষণা করে বক্তব্য রাখেন জেলা ১২ জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রতন ভাস্কর। এই শিবিরে বক্তব্য রাখেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক সুবীর রায় ও মালদা জেলা ব্লাড ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ প্রলয় দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মলি দাস। এদিনের শিবিরে ৩ জন মহিলা কর্মচারী সহ ৩৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই কর্মসূচী উপলক্ষে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। □

নিরঞ্জন প্রামাণিক

দক্ষিণাঞ্চল

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের উদ্যোগে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী গত ১২ মে ২০১৫ বি জি প্রেস স্পোর্টস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সামাজিক কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অঞ্চলের সভাপতি সন্দীপ বিশ্বাস। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে অঞ্চল সম্পাদক সুব্রতকুমার গুহ তীব্র দাবদাহের মধ্যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম আন্দোলনের ফাঁকেও সামাজিক কর্মসূচীর অংশ হিসাবে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচীতেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ নাগ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ বিরোধী নীতির নানান দিক উল্লেখ করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বকেয়া মহার্ঘভাতাসহ অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামের ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করে যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচানোর লক্ষ্যে দীর্ঘ প্রায় ষাট বছর ব্যাপী সংগঠনের গৌরবজ্জ্বল ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনী সমাবেশে অঞ্চলের কর্মী নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ ঘোষ এবং প্রাক্তন অঞ্চল সম্পাদক খগেন চক্রবর্তী রক্তদাতাদের উৎসাহিত করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরে ৫ জন মহিলা সহ মোট ৩৮ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন। □

মে দিবস

গত ৪ মে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশন যথাযথ মর্যাদার সাথে দিনটি পালন করে বঞ্চনার বিরুদ্ধে ও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ নিয়ে। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে মে দিবসের তাৎপর্য স্মরণ করে আলোচনা সভা শুরু হয়। সভাটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি অঞ্জন ব্যানার্জী ও প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু সরকার। আলোচনাসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণআন্দোলনের নেতা শ্রীদীপ ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে কর্মচারীদের আগামী দিনের লড়াইকে উদ্বুদ্ধ করেন। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
44th Year, 1st Issue, May 2015

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

বিভিন্ন সমিতির আন্দোলনের কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গ পেনশনার্স সমিতি

সমাবেশের প্রধান বক্তা ডা. সূর্যকান্ত মিশ্র। সমাবেশের একাংশ।

গত ১৪ মে চারটি মূল দাবি যথা ৪৮ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান, রাজ্যে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, পেনশনার্সদের জন্যও ক্যাশলেস ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পেনশন ব্যবস্থার সুরক্ষা দাবিতে রানী রাসমনি রোডে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা সমাবেশে যোগদান করেন। একই দিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে শিলিগুড়িতে এই কর্মসূচী হয়।

কলকাতা সভা শুরুর আগে এদিন দুপুর ১২টায় নবান্নতে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে পেনশনার্স সমিতির এক প্রতিনিধি দল দেখা করতে যান। তাঁদের হাতে ছিল ৬০ হাজার পেনশনার্স স্বাক্ষরিত বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত দাবিপত্র। মুখ্যমন্ত্রী বা কোন মন্ত্রীই দেখা করার জন্য সৌজন্য বোধ করেননি। এক জন আধিকারিক দেখা করলেও তিনি সমস্যাগুলি সম্পর্কে নীরব ছিলেন।

সমাবেশ পরিচালনা করেন সুবল দে, মুশারফ হোসেন, অলকা চক্রবর্তী ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

সমাবেশে মুল বক্তা ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র।

তিনি কেন্দ্রের ও রাজ্যের দুই সরকারের আর্থিক ও রাজনৈতিক নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। রাজ্যে যে আর্থিক বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও দুর্নীতির ঘটনা ঘটে চলেছে তার তীব্র সমালোচনা করেন।

মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে এবং বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের নিবিড় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এই সমাবেশে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য, পেনশনার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক অজয় সেন, সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক পাচকড়ি নায়েক বক্তব্য রাখেন। □

শুভেন্দু মানিক্য সেনগুপ্ত

ডেয়ারীর কর্মচারীদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ আছড়ে পড়ল গো-সম্পদ ভবনে

সংস্কারের দোহাই দিয়ে রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ১১৩৮ জন কর্মচারীকে স্বাস্থ্য দপ্তরে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মী হিসাবে চাকুরি জীবন শুরু করে এখন বদলে যাচ্ছে দপ্তর। নজিরবিহীনভাবে দপ্তর বদল করার নেপথ্যে আছে সরকারের সংস্কারের অজুহাত। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের এইরকম স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতেই ৬ দফা দাবি নিয়ে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ৭টি কর্মচারী সংগঠন গত ১৯ মে গো-সম্পদ ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালন করলেন। বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাসব্যান্ড্রি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায়চৌধুরী। সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেন, এই সরকার কর্মচারীদের কোনো কথা শুনতে চায় না। দপ্তর সম্পর্কে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত সরকার নিতে চলেছে অথচ দপ্তরের কোনো কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে কোনো আলোচনার প্রয়োজন মনে করে না। এই সরকার গণতন্ত্রের ধার ধারে না। একটা সভা করার পর্যন্ত অনুমতি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। অথচ এরা যখন বিরোধী দলে ছিল তখন এইসব গণতান্ত্রিক সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেছে এবং অনেক সময় গণতন্ত্রের অপব্যবহার করেছে। আজকের সভার কোনো অনুমতি সরকার দেয়নি, তাই আমরা গাড়িতে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে এই সভা পরিচালনা করতে বাধ্য হচ্ছি। এই সরকার কর্মচারীদের সঙ্গে ছেলেখেলা করছে। বিভিন্ন দুধের ডিপোতে যে মহিলা কর্মচারীরা কাজ করতেন তাঁদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সভাতে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশিষ ভট্টাচার্য। অন্যান্য সংগঠনগুলির পক্ষে বক্তব্য রাখেন সুখেন কুণ্ডু, অমল সরকার, তরুণ চক্রবর্তী, অর্জুন মান্না, রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, স্মরজিৎ কিস্কু, প্রশান্ত সাহা প্রমুখ। বক্তারা প্রত্যেকেই সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, অবিলম্বে বদলির আদেশনামা প্রত্যাহার করতে হবে, কারণ বদলির এই আদেশ বেআইনী। সরকার যদি তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করে তবে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য কর্মচারীরা প্রস্তুত। সবচাইতে দুঃখজনক হল বদলির আদেশনামার খবর পেয়ে দুই জন কর্মচারী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। অনেক কর্মচারী আছেন, যাঁদের আর মাত্র কয়েক মাস বাকী আছে অবসর গ্রহণের, তাঁদের পর্যন্ত বদলি করা হয়েছে। সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য কর্মচারীরা ধরে ফেলেছেন। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ন্যায্যমূল্যে জনগণকে দুগ্ধ সরবরাহের পরিবর্তে সরকার বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থাকে তুলে দিতে চায়। বেসরকারী দুগ্ধ ব্যবসার কোম্পানী আমূল, মেট্রো ডেয়ারীর ব্যবসাকে সুযোগ করে দিতে সরকারী ডেয়ারীগুলিকে তুলে দিতে চাইছে। বক্তারা আরো বলেন, ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে এই সরকার গত চার বছরে বেশ কয়েকবার দুধের দাম বাড়িয়ে জনগণকে অসুবিধার মধ্যে ফেলেছে।

(সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির ডেপুটেশন কর্মসূচী

পঃ বঃ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে, গত ৮ মে, ২০১৫ খাদ্য ভবনে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া ৪৮% মহার্ঘ ভাতা প্রদান ও ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন সহ খাদ্য বিভাগের কর্মচারীদের নিজস্ব জরুরী দাবি নিয়ে মোট দশ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে টিফিন বিরতিতে খাদ্য কমিশনের কাছে গণ-ডেপুটেশনের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। খাদ্য ভবনের কর্মচারীরা ছাড়াও, সমিতির সব জেলা থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সহ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে এই কর্মসূচীতে অনেক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। একই সাথে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নির্ধারিত বিক্ষোভ কর্মসূচীও প্রতিপালিত হয়। বিভিন্ন দাবি সংবলিত বড়ি পোস্টার ও ব্যাজ পরা প্রায় ৪০০ জন কর্মচারীর স্লোগান মুখরিত মিছিল খাদ্য ভবনের অভ্যন্তরে পরিক্রমা শেষে কর্মচারী জমায়েতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক, অসিত ভট্টাচার্য্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এরপর পঃ বঃ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত রায় বক্তব্য রাখেন।

বিভাগের কর্মচারীদের জন্য সুষ্ঠু বদলি নীতি চালু করা, সমস্ত শূন্যপদ পূরণ, মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকরি, পরিদর্শক শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য ৩:২:১ হার চালু সহ বিভাগে অপচয় বন্ধ করা, চাল সংগ্রহ, খাদ্য বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে সংগঠনের বক্তব্য ও দাবি তিনি উত্থাপন করেন। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

ডেপুটেশনের কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে কলকাতার সদর দপ্তরে লাগাতার প্রচার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রতিদিন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মীদের নিয়ে স্কোয়াড সংগঠিত করা হয়েছিল।

৮ মে খাদ্য ভবন প্রাঙ্গণের সর্বত্র মুখরিত সংগ্রামের পরিপূর্ণ মেজাজ নিয়েই খাদ্য দপ্তরের কর্মচারীরা এই ডেপুটেশনে অংশ নেন। খাদ্য কমিশনার ডেপুটেশন নিজে গ্রহণ করেন নি। খাদ্য বিভাগের সচিবের কাছে ১০ দফা দাবি নিয়ে সমিতির নেতৃত্ব আলোচনা করেন। আরেকটি দিন নির্দিষ্ট করে সমিতির উত্থাপিত দাবিগুলি নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দেন বিভাগের সচিব। প্রশাসনিক সন্ত্রাস ও সংগ্রাম আন্দোলনের কর্মসূচী পালনের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করেই খাদ্য ভবন প্রাঙ্গণের জমায়েত ছিল এই সময়কালের সর্বোচ্চ জমায়েত।

খাদ্য দপ্তরের কর্মচারীদের ১০ দফা দাবি

১. অবিলম্বে বকেয়া ৪৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিয়ে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করতে হবে।
২. সংগঠনগুলির সাথে আলোচনা করে সকলের জন্য এক সুষ্ঠ বদলী নীতি চালু করতে হবে।
৩. বিভাগের সকল শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে।
৪. কর্মরত অবস্থায় প্রয়াত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকরির ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে।
৫. পরিদর্শক শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ৩:২:১ হার চালু করতে হবে এবং তাঁদের জন্য বর্ধিত হারে CA / FTAর ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. Health Scheme-এর সুযোগ দ্রুত কর্মচারীর কাছে পৌঁছে দিতে প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে।
৭. বিভাগে সমস্ত রকম অপচয় বন্ধ করতে হবে।
৮. বিভাগে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করতে হবে। খাদ্য দ্রব্যাদির বণ্টন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠ করে তুলতে হবে।
৯. বিভাগের সমস্ত কর্মচারীর জন্য কম্প্যুটার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. গ্রুপ ডি সহ সকল ক্যাডারের পর্য্যায় তালিকা তৈরী ও অবিলম্বে পদোন্নতির আদেশনামা প্রকাশ করতে হবে। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের দাবি দিবস

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ১২ মে ২০১৫ কলকাতার রানী রাসমনি রোডে ২১ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় জমায়েত, বিক্ষোভ কর্মসূচী ও দাবি প্রস্তাব গ্রহণের কর্মসূচি প্রতিপালিত হয়। এর আগে ব্লকস্তর থেকে শুরু করে জেলাস্তর পর্যন্ত এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছিল। যদিও কিছু ব্লকে প্রশাসনিক বাধার কারণে এই কর্মসূচী প্রতিপালন করা সম্ভব হয়নি।

রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে যুক্ত নার্সিং কর্মচারীরা ইদানিংকালে বিস্ময়কর ভাবে প্রতিনিয়ত সরকারী অবহেলা ও উৎপীড়নের শিকার হয়ে চলেছেন। যার ফলে কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের পাশাপাশি তীব্র হতাশার জন্ম নিচ্ছে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যত ব্যাহত হচ্ছে। রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর রাজ্যের মানুষের সাথে সাথে নার্সিং কর্মচারীরাও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন ও কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের যে প্রত্যাশা করেছিলেন, বিগত চার বছর সময়কালে সেই প্রত্যাশা পূরণ তো হয়-ই নি বরং উত্তরোত্তর কর্মচারীদের উপর বিভিন্ন রকম আক্রমণ (শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার), বদলীর হুমকি ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাসপাতাল ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই হামলা আক্রমণের প্রথম শিকার হচ্ছেন নার্সিং কর্মচারীরা। জোর করে শাসকদলের সংগঠনের সদস্য হবার জন্য চাপ দেওয়া, নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের পতাকা তলে সমবেত হবার ক্ষেত্রেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানারকম হুমকি ও

(সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।